গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের ইশতেহার

(প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ)

(খসড়া)

“জাগো বাহে কোনঠে সবায় ...”

- কৃষক নওয়াব শহীদ নূরলদীন

১৭৬০-১৭৮৩

“মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি।

নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না ...”

- শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস

৫ই আগস্ট, ২০২৪

ভূমিকা

নিপীড়িত দক্ষিণ এশিয়া এই মুহূর্তে গণঅভ্যুত্থান জ্বরে আক্রান্ত। ২০০৬ সালে নেপালে রাজতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে এই জ্বর সংক্রমনের শুরু; গত তিন বছরের মধ্যে শ্রীলংকা, বাংলাদেশ ও নেপালে একের পর এক তিনটি গণতান্ত্রিক জাগরণ সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে যার তীব্র রক্তক্ষয়ী লক্ষণগুলো হাজির হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের দেশসহ গণ-অভ্যুত্থানের স্বাক্ষী হয়েছে এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশাসিত অঞ্চলগুলো।

বিশ্বায়নের বাস্তবতায় বৈশ্বিক শোষণ যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি নিপীড়িতের লড়াইও নতুন আকার পেয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় নিপীড়িত জনতার লড়াই হাজির হয়েছে ক্রমাগত গণতান্ত্রিক জাগরণ তথা গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ইরান, চীন, রাশিয়ার মতো আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে বহু-মেরু (Multi-polar) বিশ্ব আজ সুস্পষ্ট বাস্তবতা, যার দরুণ শেষ হচ্ছে নব্বই পরবর্তী আমেরিকান-ইউরোপীয় একচ্ছত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের যুগ।

আধিপত্য হারাতে বসা পশ্চিমা শক্তি মরিয়া হয়ে নির্মম গণহত্যা চালাচ্ছে ফিলিস্তিনে, সরাসরি আক্রমণ করছে ভেনেজুয়েলার মতো সার্বভৌম রাষ্ট্রে, ফলত এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে আধুনিক লিবারেল দুনিয়ার মানবাধিকার, স্বাধীন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার ও শান্তির প্রতিজ্ঞা কতোটা ঠুনকো। অন্যদিকে আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠা নতুন শক্তিগুলোও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যার ফলাফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘনিয়ে উঠছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সীমান্ত হত্যা থেকে শুরু করে পানির ন্যায্য হিস্যা প্রশ্নে।

বৈশ্বিক আধিপত্যবাদের ক্ষয় ও সংগ্রামী জনতার সংকল্প, উদ্যম ও সাহসী লড়াইয়ের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে গণমানুষের জেগে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল জুলুমিয়াত, নিও-লিবারেল বেকারত্ব, দেশে-বিদেশে স্বস্তায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আদায়ের শোষণমূলক অর্থনীতি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে চালানো গুম, খুন, ক্রসফায়ার, ডিজিটাল আইনে জেল-জরিমানার জুলুম ও বিদেশি দালালদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছে।

হাজারো শহীদ ও গাজীদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জুলাই, দুই হাজার চব্বিশে বাংলাদেশের আপামর গণমানুষ বৈদেশিক আধিপত্যবাদমুক্ত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষাকে হাজির-নাজির করেছে। ঊনসত্তর, একাত্তর থেকে নব্বই পেরিয়ে চব্বিশে এসে এই অঞ্চলের গণমানুষ বিশ্বকে তাদের তৃতীয় গণজাগরণের স্বাক্ষী করেছে। মানবদেহে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতিকর রোগ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তীব্র জ্বর

বারবার ফিরে আসে, তেমনি আমাদের সমাজদেহ থেকে শোষণমূলক, জুলুমবাজীর রোগ যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হবে, ততদিন রক্তক্ষয়ী গণজাগরণ অথবা গণ-অভ্যুত্থান বারবার ফিরে আসবে।

আমরা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবীগণ নিজেদের সর্বোচ্চ কোরবানিকে কবুল জেনে গণমানুষের লড়াইকে সংগঠিত করে তুললেই কেবল গণজাগরণের তরবারিতে কাটা পড়বে পশুতুল্য জালিমবাজীর মাথা। আমাদের এই সময়ের কর্তব্য নতুন বৈশ্বিক বাস্তবতায় ফিনিক্সের মতো জেগে ওঠা নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের মহান লড়াইকে পূর্ণাঙ্গ ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব অর্জন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

আমাদের আগত, অনাগত সন্তান, ভাই, বোনদের রক্তাক্ত পরিণতি ঠেকাতে এবং দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের নিপীড়িত জনতার মুক্তি নিশ্চিতে এই লড়াইয়ে আমাদের নামতেই হবে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মহান লড়াইকে স্পষ্ট করে তুলতে ও তার লক্ষ্যকে দৃশ্যমান করতেই আমরা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করছি এই ঐতিহাসিক ইশতেহার –

ক। গণবিরোধী রাজনৈতিক ধারা

পলিমাটিতে আবাদ হওয়া নদীভিত্তিক এই বদ্বীপ অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবেই সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাণ-প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি সুদীর্ঘকাল ধরেই এই অঞ্চলে বসত গড়তে আকৃষ্ট করেছে নানা নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে। প্রাচীন তন্ত্র নির্ভর কৃষিসভ্যতা, আর্য আক্রমণ, বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির বিকাশ ও ইসলামের আগমন পেরিয়ে বাংলা সালতানাতের সময় থেকে এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার ভ্রূণ বিকশিত হতে থাকে। একইসাথে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, মসলিন শিল্প ও মসলা বাণিজ্যের বিকাশ এই অঞ্চলকে করে তোলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে স্বয়ংসম্পুর্ণ ও শক্তিশালী।

সুবে বাংলায় এই সভ্যতাগত উৎকর্ষ আরো পরিণত হলেও মধ্যযুগীয় শাসনের সীমাবদ্ধতা ও দোষ-ত্রুটির ফলে অতি দ্রুতই তা ডাচ, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চসহ বৈদেশিক ঔপনিবেশিক বণিকদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মুখে অসহায় হয়ে পড়ে।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার খোঁজার তাড়না থেকে সমৃদ্ধ বাংলা অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন। এই আগমনের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ও বাংলার মধ্যযুগীয় অভিজাতদের পরাজিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে। পলাশির যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ ও ১৭৯৩ সালে ঘোষিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানী ধাপে ধাপে পূর্নাঙ্গ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।

ঔপনিবেশিক আমল শুরু থেকেই এই অঞ্চলে শোষন, জুলুম ও প্রতারণার উপরে ভিত্তি এই দুইটি রাজনৈতিক ধারার বিকাশ ঘটেছে -

গাঠনিক সময়: ১৭৫৭-১৮৫৮ (Formative Years: 1757-1858)

পলাশির যুদ্ধপরবর্তী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ইংরেজ কোম্পানী বাংলার নওয়াব ও দেশীয় অভিজাতদের সামরিক ক্ষমতাকে খর্ব করে কোম্পানির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ও সামরিক শক্তি তৈরি করে। ফলত, প্রথমবারের মতো বিদেশি প্রভুর অনুগত দেশীয় অস্ত্রধারী বাহিনী বা দালাল শ্রেণি তৈরি হয়। বাংলার দেওয়ানী লাভ করার পরে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের জন্যে কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিতে থাকে যা এই অঞ্চলে প্রথম শোষণমূলক আমলাতন্ত্রের জন্ম দেয়।

আমলার কাজ সেবা না হয়ে বরং হয়ে দাঁড়ায় লুট এবং লুটের মাল বিদেশে পাঠানো। এই লুটের মালের নিরাপত্তা দেয়া আর করের চাপে অতিষ্ঠ গণমানুষের বিদ্রোহ ঠেকাতে তৈরি হয় দমনমূলক পুলিশ। ব্রিটিশ লুটেরা বণিকদের

ব্যাবসার পার্টনার, তাদের ব্যাংকার হিসেবে গড়ে ওঠে একটি দেশীয় অলিগার্ক শ্রেনী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বিদেশি প্রভু, লুটেরা ও অত্যাচারী আমলাতন্ত্র এবং দেশীয় মহাজন; এই শ্রেণি নির্ভর একটি রাজনৈতিক ধারা তৈরি হয় যার মূল উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়ায় লুট, পাচার ও জুলুম। **এই রাজনৈতিক ধারাটিই গণবিরোধী ধারা যার অস্তিত্ব আজও বিরাজমান।**

বিদেশি প্রভুদের দালাল বা পার্টনার আমলাতন্ত্র, লাঠিয়াল বাহিনী ও তথাকথিত ব্যবসায়ী কিন্তু মূলত লুটেরা ও দখলবাজ দেশীয় মহাজনেরা মিলিতভাবে একটি রাজনৈতিক শক্তি। এই অঞ্চলের মানুষ সাতচল্লিশ, ঊনসত্তর, একাত্তর, নব্বই এবং চব্বিশে বার বার লড়াই করলেও এই ধারাটিকে কোনোদিনও চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে পারেনি, কারণ এদের কখনো পরিষ্কারভাবে জাতীয় রাজনীতিতে একটি শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় নি।

আমলাতন্ত্র, পুলিশ, আর্মি ও ব্যবসায়িক ম্যানেজমেন্টকে রাজনীতির বাইরের বিষয় মনে করা হয়েছে এবং রাজনীতিকে নানাপ্রকার দল ও সংগঠনের মধ্যেই উপস্থিত হিসেবে ভাবা হয়েছে। এই চিন্তাগত দৈন্যের ফলে সৃষ্ট ক্যামোফ্লাজের (Camouflage) কারণেই এই জালেম রাজনৈতিক শক্তি এখনো টিকে আছে।

গণবিরোধী ধারা = বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ + আমলাতন্ত্র + দেশীয় লুটেরা মহাজন

সাতচল্লিশের পরে সব দোষ ব্রিটিশদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে এরা দায়মুক্তি নিয়েছে, একাত্তরের পরে পাকিস্তানি ও বিদেশি শাসনের কাঁধে সব দায় চাপিয়ে পিঠ বাঁচিয়েছে এই এস্টাবলিশমেন্ট। নব্বইয়ে এরশাদ আর চব্বিশে হাসিনা ও আওয়ামীলীগকেই সামনে রেখে পেছন থেকে নিরাপদে থেকেছে এই জালেম ব্যবস্থা যদিও ইতিহাসের এই প্রতিটি পর্বেই এরা ছিলো জালিমের আজ্ঞাবহ, হুকুমবরদার আর লাঠিয়াল। রাজনৈতিক দলের কাঁধে চেপে এই গণবিরোধী শক্তিই মূলত ছিলো জুলুমের মূল বাস্তবায়নকারী।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, শহীদ তিতুমীর নূরলদীনদের নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ থেকে ১৮৫৭ এর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মোকাবেলা করতে গিয়ে গণবিরোধী শক্তি কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (গণরাজনৈতিক ধারাটির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে দেয়া হবে)। নিপীড়িত গণমানুষের লড়াইয়ে শক্তি হিসেবে কাজ করে কৃষিভিত্তিক সামাজিক বন্ধন এবং এই লড়াই তার রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করে ফকির-সন্ন্যাসী, মুজতাহিদদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে।

আইন ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা গঠন: ১৮৫৮-১৯৪৭

(Legal-Constitutional Framework: 1858-1947)

১৮৫৭ সালে সিপাহী-জনতার মহাবিদ্রোহ পরাজিত হলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি, কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করে। গণবিরোধী ঔপনিবেশিক শক্তি এই সময়ে গণমানুষের লড়াকু চেতনার উৎস স্থানীয় ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রাজনীতি ও আইনগত বৈধতার কেন্দ্র থেকে অপসারণ করে রানী ভিক্টোরিয়ার ফর্মানকে সকল আইনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ।

১৮৫৮ এর ফর্মান থেকেই এই অঞ্চলে "সাংবিধানিক" ব্যবস্থার শুরু, যা প্রথম থেকেই রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে জনগণের স্থানীয় জীবন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন (Alienate) করে তাকে পরিণত করে স্বয়ংক্রিয় লুটপাট ও দমনের যন্ত্রে।

পরবর্তীতে এই অঞ্চলে আমরা যতগুলো আধুনিক সংবিধান দেখেছি (১৯৫৬ থেকে শুরু করে ১৯৭২ পর্যন্ত) তার প্রতিটিই আমাদের স্থানীয় গণমানুষের যাপিত জীবন, সংকট, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এইসব সংবিধানের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানসমূহ (পুলিশ, আদালত, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি) জনগণের প্রয়োজনে গঠিত না হয়ে নির্মিত হয়েছে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া লুটপাট, জুলুমের ফর্মান তামিলের যন্ত্র আকারে।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও, আজ আমরা যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে গেলে আমাদের কখনোই মনে হয় না যে আমাদেরই গাঁটের পয়সায় আমাদেরকেই সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এইসব প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে বরঞ্চ আমাদের যাপিত জীবনের বাস্তবতা, চাহিদা ও সংকট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন (Alienated) একটি প্রতিকূল উপদ্বীপে দাস হিসেবে মালিকের কাছে ভিক্ষা চাইতে চাওয়ার মতো মর্যাদাহীন অবস্থায় আমরা নিজেদের আবিষ্কার করি। আমাদের পুলিশকে দেখলে নিরাপত্তার আশা জাগ্রত না হয়ে ভয় ও আশঙ্কাই মনে জাগে, কোর্ট-কাচারির কথা মনে হলে বিচারের আশ্বাস নয় বরং অনুভূত হয় আসন্ন হয়রানিজনিত ক্লান্তি। একমাত্র দেশীয় লুটেরা মহাজনেরাই এইসব প্রতিষ্ঠানে যথাযথ সেবা পেয়ে থাকে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের কাজে ব্যবহারও করতে পারে।

- **নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য**
- **কমিউনিটিভিত্তিক অর্থনীতি ও রাজনীতি**

বনাম

- **চাপিয়ে দেয়া ঔপনিবেশিক আইন**
- **লুটেরা অর্থনীতি, জালেম প্রতিষ্ঠান**

বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তি, আমলাতন্ত্র ও দেশীয় লুটেরা মহাজনদের সমন্বয়ে গঠিত গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে গণমানুষের স্বতঃস্ফুর্ত ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভ যেনো কখনোই ফকির-সন্ন্যাসী, তিতুমীর কিংবা নূরলদীনদের দেখানো পথে সরাসরি লড়াইয়ে রূপ না নেয় তা নিশ্চিত করতে **'সাংবিধানিক'** ব্যবস্থার অধীনে **'প্রজা'**দের আর্জি জানানোর উপায় রাখা হয়। বিদ্রোহী টোটা-বল্লমের পরিবর্তে গণমানুষের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় অ্যাপ্লিকেশনের ফর্ম।

এই সময়ে আর্জি জানানো ও গণবিরোধী শক্তির সাথে দেন-দরবারের রাস্তা হিসেবে রাজনৈতিক দল ও সংগঠনভিত্তিক পার্টি পলিটিক্সের প্রবর্তন করে গণবিরোধী শক্তি (পার্টি পলিটিক্স ভিত্তিক গণবিচ্ছিন্ন ও প্রতারণামূলক এই রাজনৈতিক ধারাটি নিয়ে নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে) যার মধ্য দিয়ে গণমানুষের লড়াইকে নখ-দন্তহীন করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়।

নয়া উপনিবেশবাদ ও রিলে রেস: ১৯৪৭-১৯৯০
(Neo-Colonialism and Relay Race: 1947-1990)

গণবিরোধী রাজনৈতিক ধারাটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় সাতচল্লিশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরে। ব্রিটিশ বৈদেশিক প্রভুদের সরাসরি তত্ত্বাবধান থেকে বের হয়ে এসে এই সময়ে এই ধারাটি প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মূলত পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে আমলারাই রাজনীতির মূল ক্রীড়ানকে পরিণত হন।

অতি দ্রুতই এই গণবিরোধী ধারাটি পুরোনো বৈদেশিক প্রভুদের শুন্যস্থান পূরন করে নতুন বৈদেশিক প্রভুদের দিয়ে তবে এইবার আর সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন নয় বরং **"উন্নয়ন অংশীদারিত্ব (Development Partner)"**, **"কৌশলগত নিরাপত্তা সহায়তা"র (Strategic Security Assistance)"** নামে বৈদেশিক সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের দালালী করাই হয়ে দাঁড়ায় বিদেশি প্রভুদের সেবা করার উৎকৃষ্ট পন্থা। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের ব্যাবসায়িক ও সামরিক স্বার্থের কাছে বন্দী হয় এই দেশ যেই বন্দীত্বের দালাল হিসেবে কাজ করতে থাকে গণবিরোধী শক্তি। তার পর থেকেই এই অঞ্চলে রাজনীতি, দেশের

মানুষের স্বার্থ ও ইচ্ছাকেন্দ্রীক না হয়ে পরিণত হয় ভারত, যুক্তরাষ্ট্রসহ নানা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তির দাবা খেলায়। এই খেলায় গণবিরোধী শক্তি কাজ করে গণবিচ্ছিন্ন, প্রতারক রাজনীতিবিদ ও বৈদেশিক শক্তির মধ্যে ডিল করে দেওয়ার মধ্যস্থতাকারী দালাল হিসেবে ।

বৈদেশিক শক্তি (A)	**বৈদেশিক শক্তি (B)**	**বৈদেশিক শক্তি (C)**
অনৈতিক সুবিধা (বেগমপাড়া...)	অনৈতিক সুবিধা (বেগমপাড়া...)	অনৈতিক সুবিধা (বেগমপাড়া...)
আমলাতন্ত্র + লুটপাটের পার্টনার (দেশীয় মহাজন)		
ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস	ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস	ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস
দালাল রাজনৈতিক দল (A)	**দালাল রাজনৈতিক দল (B)**	**দালাল রাজনৈতিক দল (C)**

রেডিও ও খবরের কাগজের বিস্তৃত, শিক্ষা ও সচেতনতার উন্নতির সাথে সাথে গণমানুষের লড়াইও শানিত হতে থাকে। বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও অবরোধের মতো গণতান্ত্রিক কর্মসূচি জনপ্রিয় ও কার্যকর হয়ে উঠে যার মুখোমুখি হয়ে গণবিচ্ছিন্ন, প্রতারক, লুটেরা রাজনীতিবিদেরা অসহায় হয়ে পড়ে। এই অসহায়ত্বের মুখে গণবিরোধী শক্তিটি জনরোষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে সব দোষ প্রতারক রাজনীতিবিদদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদের সরিয়ে নিজেরাই সরাসরি ক্ষমতা দখল করে শোষণ-শাসনের কাঠামো টিকিয়ে রাখার কৌশল অবলম্বন করে।

এই পন্থাতেই ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা ঠেকাতে ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে দিয়ে গণবিরোধী আমলাতন্ত্র আইয়ুব খানকে দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করে। ১৯৮২ তে দেশের গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার সুযোগে গণবিরোধী শক্তি জেনারেল এরশাদের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। সামরিক শাসন এইখানে মূলত গণবিরোধী আমলাতন্ত্র আর লুটেরা মহাজনদেরই এনফোর্সার; সামরিক আমলাতন্ত্র সমগ্র আমলাতন্ত্রেরই মারদাঙ্গা অংশ তথা খড়গহস্ত।

ঊনসত্তর আর নব্বইয়ে এই সরাসরি গণবিরোধী শাসন গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে প্রতিবারই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা গণবিরোধী শক্তি প্রতারক, আপোষকামী, গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদদের সাথে ডিল করে ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচিয়েছে। গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদেরা সামনে এসে তথাকথিত গণতন্ত্রের ক্যামোফ্লাজ তৈরী করে পর্দার পেছনে নিয়ে রক্ষা করেছে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া গণবিরোধী শক্তিকে।

১৯৫৮ থেকেই গণবিচ্ছিন্ন, প্রতারক রাজনীতিবিদদের নিপীড়ন, গণরোষের সুযোগ নিয়ে গণবিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান এবং গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাচক্র বারবার ঘটেছে। কিন্তু প্রতিবারেই রিলে রেসের মতো গণবিরোধী শক্তি দূর্বল হয়ে গেলেই রাজনীতিবিদদের পেছনে চলে গিয়ে নিজেদের বাঁচিয়েছে এবং পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে।

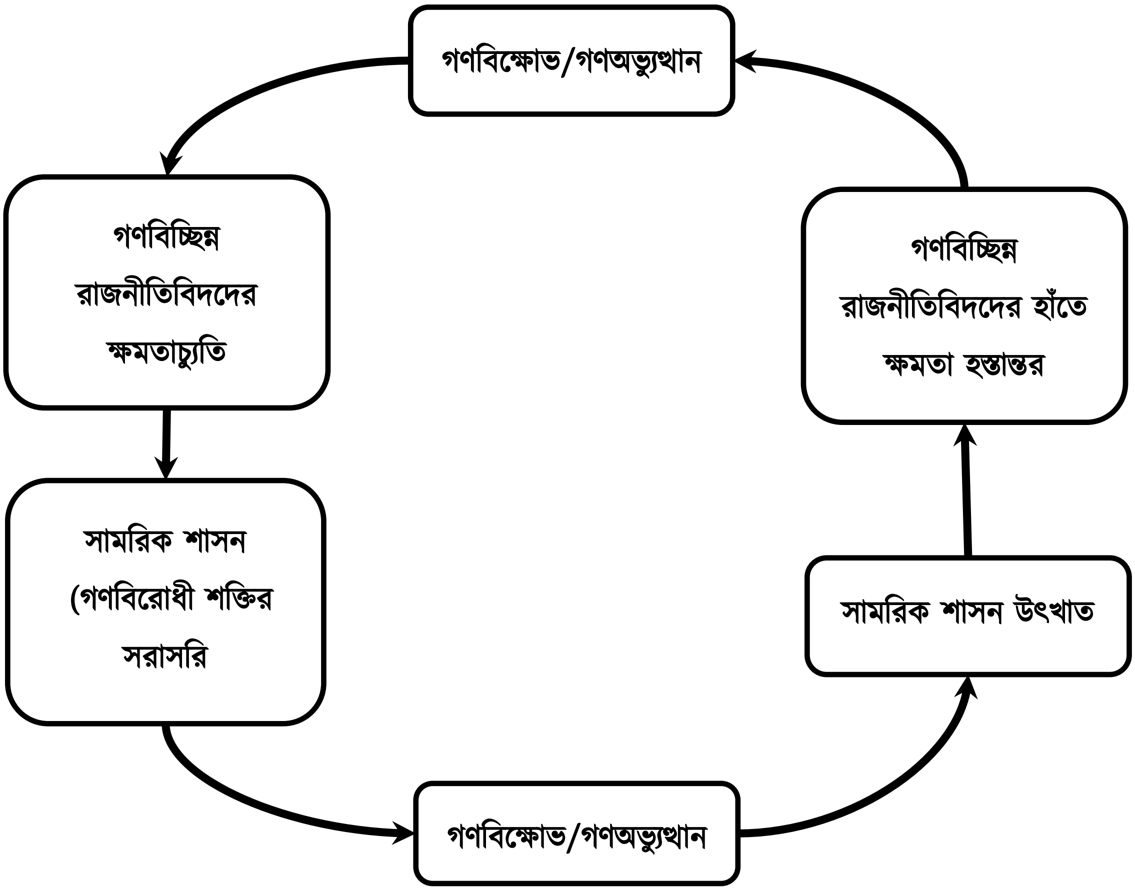

নিও-লিবারেল ছদ্ম গণতন্ত্র, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ও ফ্যাসিবাদ: ১৯৯০-২০২৪ (Neo-Liberal False Democracy, Caretaker System and Fascism: 1990-2024)

নব্বইয়ের পরে থেকেই সারা বিশ্বে পশ্চিমা লিবারেল আধিপত্য জারি হয়। বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে দেশের অর্থনীতিকে বর্গা দিয়ে দেশকে সস্তা শ্রমের দেশে পরিণত করে গণবিরোধী শক্তি। রাজনৈতিকভাবে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে রাজনীতিকে পরিণত করা হয় ম্যানেজারিতে। যখন যে দল গণরোষ সামলে বৈশ্বিক নিও-লিবারেল অর্থনীতির স্বার্থকে দেশে রক্ষা করতে পারবে তাদের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাকেই ‘গণতন্ত্র’ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়।

এই দেশে রাজনৈতিক দল যেহেতু কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয় বরং পারিবারিক দাসত্ব অথবা আদর্শিক অন্ধত্বের মধ্য দিয়ে গঠিত একেকটি গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের যন্ত্র এবং নির্বাচনও জনগণের সম্মতি গ্রহণের প্রতিষ্ঠান নয় বরং পেশিশক্তি ও অর্থ প্রয়োগে জনগণের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া সেহেতু রাজনৈতিক পরিসরে, বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সময়ে পেশিশক্তির সংঘাত ও যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে। এই জোর যার মুল্লুক তার অবস্থাই প্রমান করে আমাদের এখানে কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নেই এবং গণতন্ত্রও নেই।

জনগণের যতটুকু অংশগ্রহন আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দেখি তা পেশিশক্তি বা নানা প্রকার সুবিধা প্রদান কেন্দ্রীক (যে সুবিধা জনগণের এমনিতেই কোনো বিনিময় ছাড়া পাওয়ার কথা কেননা আমরা এই কারনেই সরকারকে খাজনা দেই)। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেইল করে যখন ধর্ষণ করা হয়, তখন তাকে সম্মতিসূচক বলার উপায় নাই কেননা সম্মতিটা এইখানে জোর করে আদায় করা; আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহনও নীরব ও প্রতিরোধহীন ধর্ষN ব্যাতীত আর কিছু নয়।

কিন্তু ক্ষমতা নিয়ে নানা গোষ্ঠীর পেশি সংঘাত যখন ক্রমাগত হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুরে দেশের জনজীবন ও মানুষের নিরাপত্তা অনন্ত হুমকিতে ফেলে দেয় তখন বৈদেশিক প্রভুদের বিনিয়োগ ও শোষণ-আধিপত্যমূলক কার্যক্রমও বাধাগ্রস্থ হতে থাকে। এই অবস্থায় গণবিরোধী নেক্সাসটির প্রয়োজন ছিলো দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিসর যাতে লুটপাট চলমান ও নিরবিচ্ছিন্ন থাকে।

এই প্রয়োজনেই আপোষরফার ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা তৈরি করা হয় যাতে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত শুরু না হয়। অন্যদিকে গণমানুষ লুটপাট, জুলুম না চাইলেও নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থিতিশীলতা চাচ্ছিলো।

জনগনের এই প্রয়োজনকে ব্যবহার করে এবং গণবিরোধী নেক্সাসের সহায়তায় বিএনপি চার সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নির্বাচনে নিজেদের জিতিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং গণবিরোধী নেক্সাসটি সরাসরি হাজির হয়ে ফখরুদ্দীনকে সামনে রেখে ক্ষমতা গ্রহন করে।

৯/১১ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যুগে যখন বৈশ্বিক নিও-লিবারেল পুঁজিবাদ ও পশ্চিমা শক্তি আগ্রাসী ভূমিকা অবলম্বন করে তখন তাদের অংশীদার হিসেবে ভারতীয় ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে বর্গা দেয়া হয় দক্ষিণ এশিয়া। বৈশ্বিক নিও-লিবারেল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় ও ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার ফাঁকফোকর কাজ লাগিয়ে ১/১১ এর মধ্য দিয়ে এই দেশে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদ কায়েম করে।

বৈদেশিক শক্তি (A)	**বহুজাতিক কোম্পানী (B)**	**বহুজাতিক এনজিও (C)**
অনৈতিক সুবিধা (বেগমপাড়া...)	অনৈতিক সুবিধা (ব্যবসায় পার্টনারশিপ...)	অনৈতিক সুবিধা (এওয়ার্ড...)
আমলাতন্ত্র + লুটপাটের পার্টনার (দেশীয় মহাজন)		
তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা		
ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস	ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস	ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস
দালাল রাজনৈতিক দল (A)	**দালাল রাজনৈতিক দল (B)**	**দালাল রাজনৈতিক দল (C)**

দেশীয় অর্থনীতি ও সামাজিক পরিসরকে বৈদেশিক আধিপত্যবাদীদের কাছে বর্গা দিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের লুটপাট ও পাচারের ক্ষেত্রে পরিণত হয় এই অঞ্চলের সম্পদ ও শ্রম। সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিজমকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অসংখ্য মানুষ গুম, খুন ও নিপীড়নের নির্মম স্বীকারে পরিণত হন। গণরোষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে এই শাসনের অবসান ঘটে। আওয়ামী লুটেরা ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়।

গণরোষ যাতে শোষন-জুলুমের কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে না পারে এবং দেশীয় লুটেরা মহাজনেরা নিরাপদ থাকতে পারে তা নিশ্চিত করতেই আমলাতন্ত্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ ও সামরিক শাসন গণবিরোধী শক্তির রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। তাই চব্বিশেও পূর্বের মতো আওয়ামিলীগের ব্যর্থতার উপরে ভর করে সামরিক শাসনের রূপে গণবিরোধী আমলাতন্ত্র ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলো।

কিন্তু এইবারে পূর্ব লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছাত্র-জনতা সামরিক শাসন অস্বীকার করে, রাজপথ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহনে সংকল্পবদ্ধ হলে **“অন্তর্বর্তীকালীন সরকার”** এর ধারণাকে মেনে নিতে বাধ্য হয় গণবিরোধী শক্তি। ১৭৫৭ এর আড়াইশো বছর পরে প্রথমবারের মতো গণবিরোধী শক্তি, তার আইন ও সংবিধান পতনের একেবারে প্রান্তসীমায় ঝুলতে থাকে, জনগণের গণতান্ত্রিক বিজয় সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়।

জুলুমি কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে গণবিরোধী শক্তি সাথেই সাথেই গণবিচ্ছিন্ন, ক্ষমতালোভী ও আপোষকামী রাজনীতিবিদদের সাথে মিটিংয়ে বসে। ছাত্র-জনতা রাজপথে থাকলেও তাদের প্রতিনিধি ছাত্রনেতারা এক ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে এই আপোষরফার নেগোসিয়েশনের অংশ হয়।

ধূর্ত শেয়ালের মতো গণবিরোধী শক্তি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, ছাত্রদের প্রস্তাবিত প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ সহ কিছু দাবি মেনে নিলেও পুরোনো আইন, সংবিধান ও আমলাতন্ত্র টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে অটল থেকে যায়। চিন্তাগতভাবে প্রস্তুতিহীন, অবিপ্লবী ও ক্ষমতার অংশ হতে উদগ্রীব ছাত্র নেতৃত্বের একটি অংশের কারনে এই চতুর নেগোশিয়েটেড সেটেলমেন্টের ফাঁদে পা দেয় বৃহত্তর ছাত্র-জনতা। সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুরোনো সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

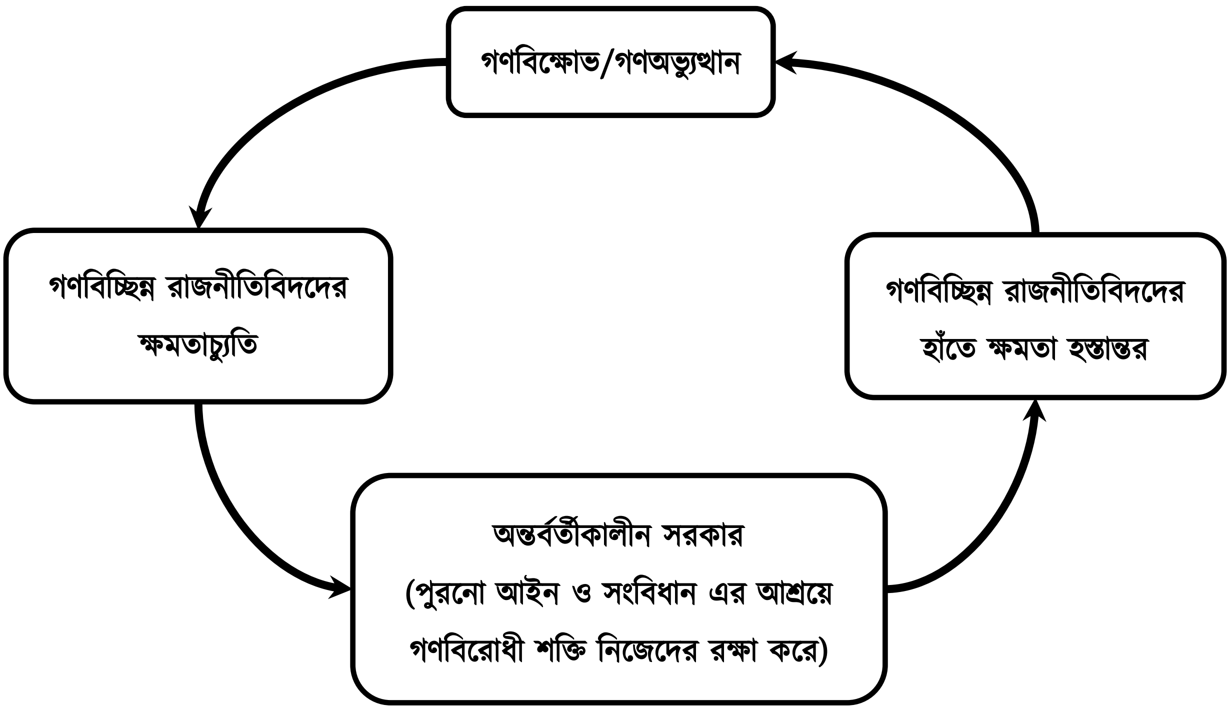

এইবার অবশ্য ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গণবিরোধী শক্তি পর্দার আড়ালে লুকোনোর সুযোগ পায় নি। তাকে সরাসরিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা আওয়ামীলীগের সকল জুলুমের (গুম, খুন, লুটপাট) প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা গিয়েছে। চব্বিশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি হাজির হওয়ার কারণ মূলত গণবিরোধী শক্তি তথা রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তিকেই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া।

তবে গণবিরোধী আইন-সংবিধান, পুলিশ, আদালত টিকিয়ে রেখে আবার তাদেরকে দিয়েই তাদের সংস্কার করার পন্থা হাস্যকর ইউটোপিয়ান চিন্তা হিসেবে হাজির হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতা মূলত আমাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে।

গণবিরোধী শক্তি আবারো প্রতারক, ছলনাময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে আশ্রয় নিতে চেয়েছে। কিন্তু জনগণ আর পেছনে হাঁটবে না। আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে ব্রিটিশ কোম্পানি থেকে শুরু করে, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া, টিক্কা, এরশাদ কিংবা হাসিনা পর্যন্ত সকল অত্যাচারীর খড়গ, কৃপাণ হিসেবে কাজ করে গিয়েছে এই গণবিরোধী আমলাতন্ত্র আর লুটেরা মহাজনেরা। যখন যে সরকার এসেছে তখনই তার হয়ে জুলুমের লুটের ভাগ নিয়েছে কিন্তু দায় নেয় নাই এই গণবিরোধী শক্তি।

আজ তাদের স্বরূপ জনগণের কাছে স্পষ্ট। আজ জনগণ ঐক্যবদ্ধ এই গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। আসন্ন বিজয়ী লড়াইয়ে গণমানুষ চুড়ান্ত আঘাত হেনে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে গণবিরোধী শক্তির আস্তানা। আমাদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎস ও ঐতিহ্য প্রাণ দেবে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রকে।

খ। গণবিচ্ছিন্ন ধারা

গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারাকে দুইটি ক্যাটাগরিতে দেখা যায়। একটি মূলধারা; যা মূলত ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে অথবা আসার বাস্তব সম্ভাবনা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে হাজির থাকে, যেমন: বিএনপি কিংবা বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। আরেকটি হচ্ছে আরোপিত আদর্শিক ধারা বা ছদ্ম বিকল্প ধারা; যা মূলধারার বিকল্প ধারা হিসেবে নিজেকে হাজির করতে চায় এবং শুধু ক্ষমতা চর্চা নয় বরং আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাকেই নিজেদের কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরে, যেমনঃ কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মূল ধারা (Mainstream Politics)

রেজিস্ট্রার্ড বৈধ রাজনীতি নির্মান ও গণমানুষের আপোষহীন রাজনীতির অবৈধকরণ- ১৮৩৮-১৮৮৫ (Creation of Lawful Registerd Politics and The Outlawing of Peoples Politics- 1838-1885)

গণবিরোধী রাজনৈতিক ধারাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক দল, পার্টি পলিটিক্স, নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই মূলত বৈদেশিক প্রভুদের সাথে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যকার দরকষাকষি ও ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয় (যার আপোষরফা করে আমলা আর দেশীয় লুটেরা মহাজনেরা)। এই কারনেই আমাদের দেশে জনসাধারণের মন জয় করা নয় বরং ক্ষমতা দেখানোই রাজনৈতিক দলের মূল প্র্যাকটিস। একই কারনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্কুলের ইতিহাস বই, রাস্তায় ঝোলানো ব্যানার আর পোস্টারের মুখ পরিবর্তন হলেও আমাদের কখনো ভাগ্য পরিবর্তন হয় না;

শোষন আর জুলুম একইরকম থেকে যায়। অথচ বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নানা সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতার গরম দেখানো দূরের কথা সর্বক্ষন জনগণের সামনে তটস্থ থাকতে হয় সমালোচনার ভয়ে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দল পরিবর্তন হলে ইতিহাস ও বয়ান পরিবর্তন না হয়ে জনগণের ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে পরিবর্তন হয় বানিজ্য নীতি, স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদি রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গসমূহ।

আমাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক দল, নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি মূলত ভেড়ার চামড়ার মতোই যার মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে নেকড়ে সদৃশ শোষক-জালেম গণবিরোধী শক্তি। পার্টি পলিটিক্সের তথাকথিত মূলধারাই (Mainstream) এখানে জনগণের যাপিত জীবন, সুখ, দুঃখ ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন আর তাই রাজনীতির এই ধারাকে আমরা বলছি প্রতারণামূলক গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারা।

ব্রিটিশ কোম্পানীর কাছে আর্জি জানানো আর দরকষাকষির মাধ্যম হিসেবে এই অঞ্চলে প্রথম যে রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী হয় তার নাম ল্যান্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন (Landholders Association)। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্যই ছিলো জমিদারদের স্বার্থে ব্রিটিশ কোম্পানীর সাথে দরকষাকষি, খাজনার সুবিধাজনক রেটের জন্যে কোম্পানীর উপরে চাপ তৈরি করা। এই সময় থেকেই এই অঞ্চলে তথাকথিত 'নিয়মতান্ত্রিক' তথা মেইনস্ট্রীম রাজনীতির শুরু। এই ল্যান্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের দরকষাকষি আর আর্জিই ছিলো কোম্পানীর কাছে বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক মেইনস্ট্রীম রাজনীতি আর ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, কৃষক বিক্ষোভ ছিলো 'সন্ত্রাস' ও উগ্রবাদিতা।

বৈধ	**অবৈধ**
বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি ও তার দালালদের দ্বারা অনুমোদিত (রেজিস্ট্রার্ড)	গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংঘবদ্ধতা (রেজিস্ট্রেশন নির্ভর নয়)
আপোষ ও আলোচনায় আগ্রহী	আপোষহীন ও লড়াকু

একইভাবে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের কৃষক আন্দোলন, ঊনসত্তর, নব্বই, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান কিংবা একাত্তরের জনযুদ্ধ বৈদেশিক প্রভু আর তাদের দেশীয় দালালদের কাছে সবসময়ই ছিলো সন্ত্রাস, উগ্রবাদিতা, দুষ্কৃতি, মব ইত্যাদি।

দলীয় সাম্প্রদায়িক-জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও তথাকথিত নির্বাচনের আড়ালে ছদ্ম গণতন্ত্রের আবির্ভাব: ১৮৮৫-১৯২০ (Communal-Nationalist Party Politics and The Emergence of False Democracy Under the Pretext of Controlled Electoral System: 1885-1920)

১৮৫৭'র সিপাহী-জনতার মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহ ঠেকাতে ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে আর্জি জানানো, আবেদন-নিবেদন করবার সুযোগ আরো বিস্তৃত করার নকশা আঁকা হতে থাকে। ক্ষুব্ধ নিপীড়িত জনতা যাতে প্রতিরোধের অস্ত্র হাতে না তুলে তা নিশ্চিত করতে স্মারকলিপি প্রদান আর গোলটেবিল বৈঠকের রাজনীতি রূপ নিতে থাকে। এই ধারাবাহিকতাতেই ১৮৮৫ তে গড়ে ওঠে প্রথম রাজনৈতিক দল 'কংগ্রেস'।

কোম্পানী শাসনের শুরু থেকেই ব্যাবসার পার্টনার হিসেবে উচ্চ বর্ণীয় মহাজনেরাই ঔপনিবেশিক শক্তির সবচেয়ে কাছের স্থানীয় মিত্রে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হলে নতুন জমিদার শ্রেনীও কোম্পানী শাসনের অন্যতম স্থানীয় ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে থাকে। এই সময় থেকেই উচ্চ বর্ণীয় মহাজন ও জমিদারদের পথ ধরে অর্থাৎ ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ শাসকদের সাথে সম্পর্ক তৈরির মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হতে স্থানীয় উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু সমাজ ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা ও মূল্যবোধ চর্চা করতে শুরু করে।

ইউরোপীয় প্রভাবে সাহিত্য, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বাংলা ভাষার গদ্যরূপ ও আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ইতিহাসে এই বিকাশই বেঙ্গল রেনেসাঁ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দৃশ্যমান বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বুদ্ধিজীবিতার আদি সূত্রগুলো রচিত ও নির্মিত হয় এই সময়ে ।

ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের কেরানী, শিক্ষক, সাংবাদিকদের কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে একটি নতুন শ্রেনী তৈরী হয় যারা দেশ ও জাতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে সক্ষম। এই শ্রেনীটিই বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্ত কিংবা সুশীল সমাজ (Civil Society) এর পূর্বসূরী যারা সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে এবং নতুন রাজনীতি নির্মান করতে সক্ষম।

ইউরোপে সেই সময়ে চলছিলো জাতীয়তাবাদের যুগ। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, কিংবা ডাচ জাতিপরিচয়ের ভিত্তিতে ইউরোপীয়রা তখন একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা আফ্রিকার সম্পদ ও বাজার দখলের উদ্দেশ্যে। বাংলায় বিজয়ী ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ এবং ইংরেজ জাতিগত গরিমা ও আত্মপরিচয়ের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা এই অঞ্চলের ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু শ্রেনীটিও বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের নিজেদের একটি জাতি গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তি ও আত্মমর্যাদা অর্জনের পথ খুঁজে পায়।

দাস যেমন বিলাসরত প্রভুকে দেখতে দেখতে তার মতো হয়ে ওঠাকেই স্বার্থকতা মনে করে তেমনি ইংরেজি ভাষা ও প্রটেস্টান্ট ক্রিশ্চান পরিচয়নির্ভর ইংরেজ জাতের দাসত্বে নিয়োজিত উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু শ্রেনীটিও এই অঞ্চলে তাদের নিজেদের ভাষা ও ধর্ম পরিচয়ভিত্তিক জাতি গঠনের প্রজেক্টকে তার মুক্তির পথ হিসেবে চিহ্নিত করে। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু শ্রেণিটি তাদের পবিত্র ভাষা সংস্কৃত ও জাতপাতভিত্তিক ধর্ম নির্ভর একটি জাতিগত পরিচয় নির্মাণ করতে শুরু করে।

বাংলায় সেই সময়ে গড়ে ওঠা উচ্চ বর্ণীয় ভাষা-ধর্ম নির্ভর 'বাঙালি' পরিচয় ও এই পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি বাংলাদেশ কল্পনা শুরু হয় তখন থেকেই।

এই অঞ্চলে জাতি, দেশ ও দেশপ্রেমের ধারণা তৈরি হয়েছে আপোষকামী উচ্চ বর্ণীয় শিক্ষিত শ্রেনীর মানসে; যেই ধারণায় মুসলমান, দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হয়েছে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। অপরায়ন কেন্দ্রিক আধুনিক হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের সূত্রপাত এই ধারণা থেকেই। ইংরেজ বিজয়ী জাতি হয়ে বাংলার জনগোষ্ঠীকে যেভাবে শাসন-শোষণ করেছে, উচ্চ বর্ণীয় "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" এর মধ্যেও রয়েছে তেমনিভাবে বিজয়ী হয়ে এই অঞ্চলের মুসলমান, দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শাসন-শোষন করবার আকাঙ্ক্ষা। এইখানে জাতি মানে উচ্চ বর্ণীয় পরিচয়, দেশ মানে এই অঞ্চলের উপরে উচ্চ বর্ণের মালিকানা আর দেশপ্রেম মানে এই মালিকানাকে টিকিয়ে রাখার খায়েশ।

ব্রিটিশ শাসনের কোলাবরেটের হয়ে নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনে উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু শ্রেনী সমাজের অন্যান্য শ্রেনীর চেয়ে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ এর ব্যর্থ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতার পাটাতন থেকে নিক্ষিপ্ত আশরাফ মুসলমান শ্রেনী এই পরিস্থিতিতে নিজেদের পরিচয় ও স্বার্থ রক্ষায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

সাবেক আশরাফ মুসলমানদের মধ্য হতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই সময়ে আলীগড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু শ্রেনীর মতোই ব্রিটিশ আনুকূল্যে একটি প্রভাবশালী মুসলমান এলিট গঠনের প্রয়াস হাতে নেন।

পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী হয়ে ওঠা বাংলায় নওয়াব আবদুল লতিফ ও পরে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ সহ অন্যান্য মুসলমান এলিট নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এবং ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রসমাজের অংশগ্রহণে ধীরে ধীরে কংগ্রেসের মডেলে একটি উর্দু ভাষিক, মুসলমান পরিচয়ভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠতে থাকে। এই রাজনৈতিক শক্তিটিই 'মুসলীম লীগ' হিসেবে ১৯০৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রিটিশ শাসকের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি, সরকারী চাকরিতে নিয়োগ ও অন্যান্য নানা প্রকার সুবিধা প্রশ্নে কর্তৃত্ব স্থাপনকারী হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তি কর্তৃক অপরায়ন ও বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ যথাক্রমে এই দুই জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠে।

অথচ আধুনিক হিন্দু পরিচয়টি ব্রিটিশ শাসনামলে জাতিগত ভাবনা থেকেই নির্মান করা অর্থাৎ 'হিন্দু' পরিচয়টি কোনো শাশ্বত ধর্মীয় পরিচয় নয়। একইভাবে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' ধারনাটিও অদ্ভুত পরস্পরবিরোধীতাই প্রকাশ করে কেননা ইসলাম ধাতগতভাবেই জাতীয়তাবাদ/গোত্রবাদ বিরোধী যেখানে মুসলমান পরিচয়টি এক ভাষা, সংস্কৃতিভিত্তিক কোনো জাতিকে নির্দেশ করে না বরং কমিউনিটি তথা উম্মাহ'র ধারনাকেই ধারন করে।

মূলত এই অঞ্চলে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়াতেই অপরায়নমূলক ও কর্তৃত্ববাদী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষমতা ভাগাভাগিতে আগ্রহী গণবিচ্ছিন্ন এলিটদের হাত ধরে।

মূলধারার রাজনীতি
জাতীয়তাবাদ কিংবা বিভাজনমূলক মতাদর্শের উপরে ভিত্তি করে গঠিত দ্বি-দলীয় প্রতিযোগিতা/রাজনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির জন্যে এই অঞ্চলের সকল এলিট শ্রেনীর সক্রিয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন আদায় জরুরী হয়ে পড়ে । এই লক্ষ্যেই ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আরো উদার হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে তারা ১৯২০ সালে প্রথমবারের মতো নির্বাচন আয়োজন করে।

এটি উল্লেখ্য যে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই নির্বাচনে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মতো 'বৈধ' দলগুলিই অংশগ্রহন করতে পারে যাদের কেউই বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে চাইছিলো না বরং চাইছিলো বিদেশী প্রভুদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে। স্থানীয় কৃষক আন্দোলনসমূহের নেতৃত্ব কিংবা প্রকৃত বিপ্লবীদের কিন্তু এই রাজনীতিতে কোনো জায়গা ছিলোই না। ঔপনিবেশিক শাসনামলে আয়োজিত সকল নির্বাচনেই এই বিদেশী তত্ত্বাবধান ও আপোষকামীতা ছিলো প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আজ প্রায় একশ বছর পরেও আমাদের দেশের রাজনীতি এখনো সেই বিভেদ ও বিভাজনমূলক, অপরায়নকারী জাতীয়তাবাদী দ্বি-দলীয় ঘেরাটোপে আটকে আছে। কংগ্রেস-মুসলীম লীগ, হিন্দুত্ববাদ আর মুসলিম জাতীয়তাবাদের জায়গা বদল করেছে আওয়ামী লীগ (এই মূহুর্তে ব্যাকফুটে থাকলেও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এখনো অক্ষত), বিএনপি তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের লড়াই।

নির্বাচনে বৈদেশিক তত্ত্বাবধান এখন রূপ নিয়েছে ইলেকশনের আগে আগে এম্বাসি ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কাছে ধর্না দেওয়া, আন্তর্জাতিক নানা সংস্থাকে আনুগত্যের দাসখত দিয়ে আসায়। এখনো সেই রাজনৈতিক দলগুলোই রেজিস্ট্রেশন পায় বা নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই অংশ নিতে পারে যারা আসলে বিদেশী প্রভু ও তার দালালদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগী করতেই আগ্রহী।

জনগণকে সাথে নিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে শাসন-শোষনের শত বছরের পুরোনো লাঞ্ছনা যারা ছিন্ন করতে চায় তেমন আপোষহীন নেতৃত্বের বিকাশ ও ক্ষমতা গ্রহনের কোন সুযোগই এই দ্বি-দ্বলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাখা হয় নি। এই ব্যবস্থায় কোন এক বা একাধিক দলকে রিপ্লেস করলে আসলে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না

(এখন যেমন আওয়ামীলীগ রিপ্লেস হচ্ছে) বরং ভেঙ্গে ফেলতে হবে এই তথাকথিত বৈধ দলীয় রাজনীতির ঘেরাটোপ এবং গণমানুষের পক্ষের রাজনীতিকেই বানাতে হবে বৈধতার মানদন্ড।

সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঠুনকো পরিচয়বাদী রাজনীতির মধ্য দিয়ে এলিটদের ক্ষমতার লড়াইয়ে এতোগুলো প্রাণ বলি হয় না যা আমাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় হয়ে থাকে (বিশেষ করে নির্বাচনের সময়ে)। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি করার বৈধতা পেতে গেলে অদ্ভুত ও গণবিরোধী শর্ত পূরণের দরকার হয় না কেবল প্রয়োজন হয় সত্যিকার গণসমর্থন। দলের রেজিস্ট্রেশন সেখানে অর্থ আর বিদেশী শক্তি আর তাদের দালালদের সাথে কানেকশনের ওপরে নির্ভর করে না; নির্ভর করে জনভিত্তির উপরে। বিদেশী এম্বাসি, রাষ্ট্রদূতদের কাছে ধর্না দেয়া তো দূরের কথা; সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনে সরাসরি বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হয় না বরং **সামান্য পরিমানে আন্দাজ করা গেলেও তা কেলেঙ্কারীর জন্ম দেয়**।

বিভেদমূলক জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ও বিদেশী শক্তি আর তার দালাল নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে একটি ছদ্ম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রাখা হয় যা সত্যিকার প্রকৃত গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে চাপা দিয়ে রাখে। পাঁচ বছর পরে একদিন ব্যালট পেপার ছাপ্পা মেরে বিদেশি শক্তি আর তার দালালদেরই ছক কেটে দেয়া অপশনগুলোর মধ্যে একটির হাতে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে শাসন-শোষনের লাইসেন্স তুলে দেয়াকেই গণতন্ত্র হিসেবে এই দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রকৃত গণতন্ত্র পাঁচ বছরে একদিন আসে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি এমনভাবেই গঠিত থাকে যে গণসমর্থনের বৈধতা ছাড়া কোনো গুরুত্বপুর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই নেয়া যায় না; গণতন্ত্র সেখানে প্রতিদিনেরই যাপিত জীবনের অংশ।

নির্বাচন

অপশন (A)	**অপশন (B)**	**অপশন (C)**
বৈদেশিক শক্তি (A) + অনুগত আমলা + দেশীয় লুটেরা দালাল মহাজন	বৈদেশিক শক্তি (B) + অনুগত আমলা + দেশীয় লুটেরা দালাল মহাজন	বৈদেশিক শক্তি (C) + অনুগত আমলা + দেশীয় লুটেরা দালাল মহাজন
নন-অপশন **(বিদ্যমান সিস্টেমের মধ্যে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই, রেজিস্ট্রেশন-নমিনেশন পাবে না)** গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃত্ব, স্থানীয় কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং অন্যান্য		

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা একই প্রক্রিয়াতেই হচ্ছে। পুরোনো কাঠামোকে পুরোপুরি ছুড়ে ফেলে একেবারে নতুন করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কমিশন, পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, আদালত ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারার কারণে আগের ব্যবস্থাই বহাল আছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃত গণতান্ত্রিক দল হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। **আসন্ন নির্বাচনও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন করে**

নির্বাচন হয় তেমন কোনো নির্বাচন হবে না। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ, আপোষরফা, সহিংসতা সব আগের মতোই আছে।

গণবিচ্ছিন্ন ধারা কর্তৃক গণমানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইকে আত্মসাৎ: ১৯৪৭-১৯৯০ (The Absorption of The People's Struggle for Rights by the Politics Alienated from Mass: 1947-1990)

গণবিচ্ছিন্ন এলিট দলীয় রাজনীতি ও আপোষরফার ব্যবস্থার বাইরে গিয়েও বিচ্ছিন্নভাবে শাসন, শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে উঠতে থাকে। নীল বিদ্রোহ থেকে শুরু করে, বাংলা থেকে উপমহাদেশের নানা স্থানে গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন কৃষক বিদ্রোহ সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে থাকে গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে।

এই অঞ্চলের শিক্ষিত সংবেদনশীল তারুণ্য এইসময়ে কংগ্রেস-মুসলীম লীগমুখী থাকলেও তথাকথিত মেইনস্ট্রীম রাজনীতি আর জনগণের প্রত্যক্ষ এই লড়াইয়ের মধ্যে থাকা দূরত্বকে তাঁদের অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন।

এই সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোতে তরুন ও সংবেদনশীল একটি অংশ জনগণের পক্ষে আপোষহীন লড়াকু পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কংগ্রেস বলয় থেকে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তরের মতো সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলন বিকশিত হয়। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার নিপীড়িত চাষা-মজুরের প্রতি সংবেদনশীল নেতৃত্ব মুসলীম লীগের মধ্যে বিকাশ লাভ করে আবুল হাশিম, ভাসানী ও যোগেন মন্ডলদের মধ্য দিয়ে।

একইসাথে নির্বাচন ব্যবস্থা মূলত বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও এর মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় গণমানুষ ধীরে ধীরে 'ভোটার' হয়ে ওঠেন এবং নির্বাচিত হতে এলিট গণবিচ্ছিন্ন নেতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে স্থানীয় চাষা-মজুরের দীর্ঘশ্বাস ও দাবির প্রতি মনোযোগী হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার ফলেই এ কে ফজলুল হকের মতো নেতৃত্ব তৈরি হয় যিনি কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করে সর্বপ্রথম গণবিচ্ছিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের রাজনীতির বাইরে এসে কৃষকের দাবি নিয়ে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গণরাজনীতিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

এই সময় থেকেই তাই নিপীড়িত গণমানুষের আপোষহীন লড়াকু রাজনীতির সাথে গণবিচ্ছিন্ন পার্টি পলিটিক্সের একটি অস্বাভাবিক সহাবস্থান দেখা যায়। গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর অপেক্ষাকৃত তরুন ও জনগণের প্রতি সহানুভুতিশীল অংশটি যেমন জনগনের লড়াইকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন তেমনি গণমানুষও সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে কৌশলে পার্টি পলিটিক্স ও ইলেকশনের মধ্য দিয়েই নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে শামিল হয়।

কংগ্রেস বলয়ের র‍্যাডিকাল অংশটি উচ্চ বর্ণীয় অপরায়নমূলক 'বাঙালী জাতীয়তাবাদে'র বেড় ভেঙ্গে গণঅংশগ্রহনের পথ বের করতে না পারায় খুব একটা সফলতা লাভ করে নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই চরমপন্থী ধারাকে সংকীর্ণতা থেকে বের করে এনে গণমুখী চরিত্র দিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত অক্ষশক্তির পক্ষ নেয়ায় এই ধারাটি আর রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

অন্যদিকে মুসলীম লীগে খাজা নাজিমুদ্দীন ও নওয়াব সলিমুল্লাহদের এলিট জমিদার রাজনীতির সাথে আবুল হাশিম, ভাসানী, যোগেন মন্ডলদের কৃষক-মজুর, দলিত, নিম্নবর্গের মজলুমদের দাবিভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে যে কৌশলগত ঐক্য গড়ে ওঠে তা খুব সফলভাবে পূর্ব বাংলার মানুষকে নির্যাতনমূলক ও কর্তৃত্ববাদী সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের হাত থেকে রক্ষা করে এবং জালেমি জমিদার প্রথার অবসান ঘটায়।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক। সাতচল্লিশে যে স্বতন্ত্র মানচিত্র এই পূর্ব বাংলার মানুষ পেয়েছে এবং জমিদার প্রথার বাইরে গিয়ে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নতির যে সুযোগ তারা আদায় করে নিয়েছে তা এই রাজনীতিরই ফসল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যদয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই একই রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করেছে। গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনৈতিক নেতাদের সাথে গণমানুষের রুটি-রুজির লড়াই একটি সমীকরণে মিলে গিয়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে রূপ দিয়েছে।

আওয়ামীলীগ দলটি তার জন্মের কিছু পর থেকেই পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসক ও বৈদেশিক নয়া প্রভুদের **(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)** সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি ও আপোষরফার রাজনীতি শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানে সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণি চাকুরি ও ব্যবসায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রে পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটদের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে প্রতিযোগিতা ও দেনদরবারের উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়।

সরকারী চাকরিতে দ্রুত প্রোমোশন পাওয়া আর ব্যবসার লাইসেন্স আদায়ের এই রাজনীতি কংগ্রেস-মুসলীম লীগের আপোষকামী রাজনৈতিক সিলসিলার বাইরের কিছু ছিলো না। এই আপোষকামীতার প্রশ্নেই মওলানা ভাসানীর মতো গণমানুষের রুটি-রুজির লড়াইয়ে সরাসরি সম্পৃক্ত নেতা আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ন্যাপ গঠন করেন।

চল্লিশের দশকে নির্যাতনমূলক ও কর্তৃত্ববাদী সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যেমন মুসলীম লীগে নওয়াব, জমিদার এবং চাষা মুসলমান-দলিত দুই পক্ষই এক হয়ে গিয়েছিলো তেমনি ষাটের দশকেও বৈষম্যমূলক পাকিস্তান রাষ্ট্রে নিজ হিস্যা বুঝে পেতে পূর্ব বাংলার আমলা-অফিসার, মহাজন আর নির্যাতিত কৃষক-শ্রমিক, আওয়ামীলীগের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা ও পরে ১৯৬৯'র এগারো দফা হাজির হয় এই রাজনৈতিক মিথষ্ক্রিয়া থেকেই।

কিন্তু চল্লিশে যেমন মুসলমান নওয়াব, জমিদারদের লক্ষ্য ছিলো হিন্দু জমিদারের মাতব্বরী থেকে নিজের জমিদারী বাঁচানো তেমনি ষাটের দশকে বাঙালী অফিসার, মহাজনদের কাম্য ছিলো কেবল চাকুরী আর ব্যবসায় পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিযোগী হটিয়ে বাজার দখল করা। দুই ক্ষেত্রেই গণমানুষ জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক বেইনসাফী আর জুলুমের বিরুদ্ধে তার লড়াই লড়ে গিয়েছে নিজেরাই এবং তাদের রক্তের উপর দিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাতে নিয়েছে নওয়াব, জমিদার, আমলা আর অফিসারেরাই।

নব্বইয়েও একইভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিষ্ঠিত এলিট নেতারা সামনে থাকলেও জীবন দিয়েছে সাধারণ ঘরের ছেলে ডাক্তার মিলন ও নূর হোসেন। বিএনপি জোট সরকার নব্বইয়ে রক্তের উপর দিয়ে ক্ষমতায় এসেও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা নূন্যতম দাবি 'তিন জোটের

রূপরেখা' বাস্তবায়ন করেনি বরং নব্বই পরবর্তী নিও-লিবারেল পশ্চিমা শক্তির সাথে আপোষরফা করেই দেশ চালিয়েছে।

স্বার্থগত কারনে বারবার সাতচল্লিশ, একাত্তর, নব্বইয়ে গণবিচ্ছিন্ন এলিট নেতারা গণমানুষের প্রকৃত রুটি-রুজির লড়াইয়ে সম্পৃক্ত হয়েছে বা তার পক্ষে দাঁড়ানোর ভান করেছে কিন্তু যখনই গণমানুষের রক্তাক্ত সংগ্রাম শেষ হয়েছে তখনই এই রক্ত নদীতে ভেলা ভাসিয়ে তারা গিয়ে বসেছে ক্ষমতার মসনদে এবং বসার সাথে সাথেই বেঈমানী করেছে গণমানুষের আত্মত্যাগের সাথে।

সাতচল্লিশের পরে জমিদার, নওয়াবেরা বাংলার মানুষকে গণতন্ত্র ও ভাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। একাত্তরে জানের ভয়ে ভারতে পালানো আওয়ামী লীগের নেতারা গণমানুষের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বৈদেশিক প্রভু ভারতের ছায়াতলে ক্ষমতা দখল করে চালিয়েছে লুটতরাজ, চাপিয়ে দিয়েছে জালেমি বাকশাল। নব্বইয়ে রাজনৈতিক দলগুলো গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানী করে 'তিন জোটের রুপরেখা' আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। এইভাবেই গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতির ধারা গণমানুষের লড়াইকে আত্মসাৎ করেছে তার নিজ স্বার্থে।

সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে গণমানুষের লড়াই আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে পরিবারতান্ত্রিক আনুগত্যও বড়ো ভূমিকা রেখেছে। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সরাসরি আধিপত্য এই অঞ্চলে থেকে দূর হলেও গণবিরোধী শক্তির তৈরী করে রাখা **রাজতান্ত্রিক** রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহ রয়েই গিয়েছে। তাই সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে গণবিরোধী শক্তির নানা গ্রুপের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে একাধিক রাজনৈতিক পরিবারকে কেন্দ্র করে।

ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ঘিরে যেমন গড়ে উঠেছিলো স্থানীয় জমিদার পরিবারগুলো; একইভাবে মুজিব বা জিয়া পরিবারকে কেন্দ্র করে সারাদেশে নানা স্থানে বংশানুক্রমিক ডাইনেস্টি তৈরী হয়েছে যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্যিকারের গণমানুষের নেতৃত্বকে রাজনীতি ও নির্বাচনে নন-অপশন করে রেখেছে।

স্বাভাবিক অবস্থা

গণমানুষের সংগ্রাম

বিচ্ছিন্নতা

গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনৈতিক নেতৃত্ব

(কংগ্রেস-মুসলীম লীগ, আওয়ামী-বিএনপি)

আপোষ

গণবিরোধী শক্তি

গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতি ও গণমানুষের লড়াইয়ের ঐক্য
(১৯৪৭ - পাকিস্তান আন্দোলন, ১৯৭১ - মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ - গণঅভ্যুত্থান)
গণমানুষের সংগ্রাম + গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক এলিট নেতৃত্ব
(৪৭-মুসলীম লীগ, ১৯৭১-আওয়ামী লীগ, ১৯৯১-বিএনপি)
বনাম
গণবিরোধী শক্তি

গণমানুষের রক্তাক্ত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সাফল্য
(পাকিস্তান হাসিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, স্বৈরাচার পতন)
গণমানুষের সংগ্রাম
প্রতারণা
গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনৈতিক নেতৃত্ব + গণবিরোধী শক্তি
(১৯৪৭-মুসলীম লীগ, ১৯৭১-আওয়ামী লীগ, ১৯৯১-বিএনপি)

এই কারনেই সাধারণ ঘরের আবু সাঈদ আর ওয়াসিম শহীদ হলেও তাদের রক্তের উপরে গিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে বসে দলীয় এলিট নেতারা; গণমানুষ ক্ষমতার বাইরেই থেকে যায়।

বিরাজনীতিকরন ও চব্বিশের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণরাজনৈতিক ধারার পুনর্জাগরন: ১৯৯০-২০২৪ (De-politicization and The Re-emergence of the Pro-People Struggle: 1990-2024)

নব্বইয়ের পর থেকেই পশ্চিমা নিও-লিবারেল সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্বে আধিপত্য কায়েম করলে খুব দ্রুতই একাধিক গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল দিয়ে গণতন্ত্র কায়েম রাখার নাটক করবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে। দক্ষিন এশিয়ায় নিও-লিবারেল সাম্রাজ্যবাদের পার্টনার হবার শর্তে বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে তুলে দেয়া হয় ভারতের হাতে আর বৈশ্বিক প্রভুদের দালাল হিসেবে অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেয়া হয় আওয়ামী লীগের হাতে।

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ ও পশ্চিমা নিও-লিবারেল অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষন কায়েমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। **সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গুম, খুন শুরু করে তা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় বিরোধী রাজনীতিবিদ, এক্টিভিস্টদের উপরে**। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে চেপে ধরা হয় মুখ। রানা প্লাজা, তাজরীনের মতো মর্মান্তিক কাঠামোগত হত্যাকান্ড ঘটে নিও-লিবারেল অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে গিয়ে, পাশাপাশি চলে ব্যাংক লুট।

এই ফ্যাসিস্ট, কর্তৃত্ববাদী বাকশালী শাসনের সামাজিক অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হয় **"আই হেইট পলিটিক্স"** মতাদর্শ। ঝুঁকিপূর্ন তারুণ্যকে বাগে আনা হয় বিরাজনীতিকরনের সংস্কৃতি দিয়ে। প্রচলিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও আপোষকামী রাজনীতিই করে আসায় এইরকম সর্বাত্মক বাকশালী ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে যে সরাসরি, র‍্যাডিক্যাল গণলড়াই পরিচালনা করা দরকার ছিলো তা গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

অন্যদিকে সমাজে ক্রমান্বয়ে জমতে থাকা বঞ্চনা, জুলুম ও শোষনের মুখোমুখী হয়ে সংবেদনশীল সচেতন তারুণ্য, লড়াইয়ের রাস্তা খুঁজতে থাকে। সাতচল্লিশ থেকে নব্বই পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের রক্ত ব্যবসা এবং আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে তাদের প্রকৃত লড়াই গড়ে তুলতে পারার ব্যর্থতা দেখে এই প্রজন্ম এইবার নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটায়।

প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকে পার্টি পলিটিক্সের নিগড়ে যে গণমানুষের লড়াইকে বেঁধে ফেলা হয়েছিলো তা ধীরে ধীরে আবারো এই নিগড় ভেঙ্গে মাথা তুলতে শুরু করে।

২০১৮ এর নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণরাজনৈতিক ধারা আবারো বিকশিত হতে শুরু করে। কোনো প্রকার রাজনৈতিক দল বা এলিট ক্লাসের অভিভাবকত্ব ছাড়াই স্কুল, কলেজের শিশু, কিশোরেরা রাজধানী ঢাকার দখল নিয়ে নেয়, ঠিক যেভাবে ফকির মজনু শাহ বা তীতুমীর মুক্তাঞ্চল গঠন করেছিলেন বগুড়া আর নারিকেলবাড়িয়ায়।

২০১৮ এর কোটা সংস্কার আন্দোলন এই ধারাকে রাজনৈতিকভাবে পরিনত করে তোলে। শতো বছরের নিদ্রা থেকে জেগে ওঠা গণমানুষের স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত লড়াইয়ের সিলসিলা এই প্রজন্মে তার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটায় চব্বিশের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা এই কারনে যে এই গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করতে জনগণ কোনো রাজনৈতিক দলের ধার ধারে নাই। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'র মতো একটি আন্দোলনের ব্যানারে **অখ্যাত**, অপরিচিত নেতৃত্বের সাথে দাঁড়িয়ে গণমানুষ এই অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছে। গণঅভ্যুত্থান সফল হওয়ার সাথে সাথে গণবিচ্ছিন্ন আপোষকামী রাজনৈতিক দলগুলো ক্যান্টনমেন্টে দৌড় দিলেও ক্ষমতা গণমানুষ নিয়ে নিয়েছিলো নিজেদের হাতে।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় ১৪০ বছর পর এই অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণ পার্টি পলিটিক্সের নিগড় ভেদ করে সরাসরি গণমানুষের ক্ষমতাকে দৃশ্যমান করেছিলো। ১৮৫৭'র সিপাহী-জনতার বিদ্রোহের দেড়শো বছরেরও বেশি সময় পরে বিদ্রোহী ফকির-সন্ন্যাসীদের সিলসিলা পুনরায় জাগ্রত হয়েছিলো ঢাকার রক্তাক্ত রাজপথে। দামাল মুক্তিসেনানীরা কোন নওয়াব, জমিদার, অফিসারের বক্তৃতাবাজির অপেক্ষা না করে ফকির মজনু শাহের মতো গুলতি নিয়ে নেমে পড়েছিলো জালেমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে।

গণরাজনৈতিক সিলসিলার পুনর্জাগরন

১৭৬০-১৮৮৫	১৮৮৫-২০১৮	২০১৮-২০২৪-...
• ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাশের কেল্লা বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ	• ব্রোকেন লিংক/পার্টি পলিটিক্স, গণবিচ্ছিন্ন এলিট কর্তৃক গণলড়াই আত্মসাৎ	• নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

শহীদ মিনারে বিপ্লবী সরকার গঠন না করে **পুরোনো** রাজনৈতিক দলগুলোর আপোষরফার অংশ হওয়ায় এবং রানী ভিক্টোরিয়ার **১৮৫৮** এর কলোনিয়াল ফর্মানের সিলসিলায় লেখা বাহাত্তরের সংবিধান বহাল রেখে দেওয়ায় এই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক জাগরণকে চূড়ান্ত বিপ্লবে পরিণত করা যায় নি। গণমানুষের ক্ষমতা রাজপথ থেকেই জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারে পরিণত না হয়ে তা চলে গিয়েছে এলিট নেতা, আমলা আর অলিগার্কদের পকেটে।

ছাত্র নেতৃত্বের যে অংশ সহজে এমপি, মন্ত্রী হওয়ার লোভে আমাদের পূর্বপুরুষদের এই শত শত বছরব্যাপী লড়াইকে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছাতে দিলো না, কিংবা যাদের রাজনৈতিক ভুলের কারণে চুড়ান্ত বিপ্লব সংগঠিত হলো না তাদের এই ভুলের কাফফারা কেবল হতে পারে চুড়ান্ত বিপ্লবের পথে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ!

এই দেশের লড়াকু জনতা থামবে না। বিপ্লবের যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে হাজারো গুলতি, পাথর হাতে কিশোর ও তরুণদের মাঝে, তারা জাতিকে নিয়ে এই লড়াই সফল করবেই ইনশাআল্লাহ! শত বছরের পুরোনো ইনকেলাবি শিঙ্গা আবার ফুঁ দিয়ে দিয়েছে ইতিহাস, জালেম কলোনিয়াল ব্যবস্থার কেয়ামত অত্যাসন্ন।

২৪ পরবর্তী আপোষকামী মূলধারা (Post 24 Compromised Mainstream)

৩রা আগস্ট, শহীদ মিনারে গণঅভ্যুত্থানের এক দফা দাবি উচ্চারিত হয়। 'ফ্যাসিবাদের বিলোপ সাধন ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নির্মানই এক দফার মূল প্রতিজ্ঞা। এই এক দফার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রটি যে ধাতগতভাবেই ফ্যাসিস্ট এবং এই রাষ্ট্রের বিলোপ করে নতুন একটি রাষ্ট্র নির্মান করতে হবে এই বৈপ্লবিক ধারনাটি প্রচ্ছন্ন আকারে হাজির হয় যা এই অঞ্চলের গণমানুষের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম মাইলফলক।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তি সময়ে ছাত্র নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভুলের ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকারের পরিবর্তে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় পুরোনো শাসন-শোষন কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখেই; ফলে ফ্যাসিবাদ বিলোপের প্রতিশ্রুতি প্রতারিত হয়। **ছাত্র নেতৃত্বের একটি অংশ সরকারে প্রবেশ করে সরাসরি কলোনিয়াল গণবিরোধী শক্তির অংশ হয়ে পড়ে।**

প্রথমে ছাত্র নেতৃত্বের এই অংশটি বিপ্লবী কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করতে গিয়ে গণবিরোধী আমলাতন্ত্র, পুরোনো কলোনিয়াল আইন-সংবিধানের তীব্র **অলঙ্ঘনীয়** বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা অতিক্রম করতে একটি গণপরিষদ

নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান তৈরি করে পুরো রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজানোর দাবিতে ছাত্র নেতৃত্ব রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

এই লক্ষ্যেই দেশের রাজনীতিতে গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব হিসেবে নতুন একটি শক্তি আকারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে **এই দুটি সংগঠনই** জাতীয় নাগরিক পার্টি হিসেবে গঠিত হয়।

এক দফা, গণপরিষদ, নতুন সংবিধান, গ্রাম পার্লামেন্ট গঠন ছাড়াও পুলিশ, আদালত, নির্বাচন কমিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শাসন-শোষনের যন্ত্র আকারে রেখে না দিয়ে এগুলোকে স্বাধীন ও জনগণের কাছে জবাবদিহীতামূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ধারনা বাংলাদেশের রাজনীতির মূলধারায় নিয়ে আসায় এই সময়ে সত্যিকার অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার রাজনীতি দানা বাঁধতে থাকে।

যদিও যেখানে বাংলাদেশে জন্মলগ্ন থেকে কোনো রিপাবলিকই গড়ে উঠেনি সেখানে **"সেকেন্ড রিপাবলিক"** দাবি করাটা ছাত্র নেতৃত্বের চিন্তার অস্পষ্টতাকেই প্রকাশ করে, তবুও তাদের মাধ্যমেই যে এই ধারণা বাংলাদেশের রাজনীতির মূলধারায় হাজির হয় গণতন্ত্র মানে যে, পাঁচ বছর পরে পরে একবার ব্যালট বাক্সে সীল মেরে বৈদেশিক শক্তি আর তার দালালদের নাটকে অভিনয় করাই গণতন্ত্র নয় বরং সম্পূর্ন নতুন ধরনের রাষ্ট্র তৈরি করা যেখানে প্রতিদিন, প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকে গণ অনুমোদনের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় তাই প্রকৃত গণতন্ত্র ।

কিন্তু প্রথম থেকেই মাস্টারমাইন্ড ও মেটিকুলাস ডিজাইন ধারনার মধ্য দিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণমানুষের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহনকে অস্বীকার করে আন্দোলনের বৈধতা ও ক্ষমতা কুক্ষীগতকরনের প্রবণতা শুরু হয়। পরবর্তীতে ছাত্র নেতৃত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই প্রবণতাকে ব্যাপক ভাবে চর্চা করায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার বাইরের গ্রামাঞ্চলের আন্দোলনের সংগঠক ও বিশেষ করে নারীরা সহ নানা শ্রেনী ও বর্গের আন্দোলনকারীগন ছাত্র নেতৃত্বের দল বা সংগঠনসমূহে ব্যাপকভাবে অবহেলিত ও নিগৃহীত হন।

পরবর্তীতে এক প্রকার ইনক্লুসিভিটি তথা টোকেনিজমের চর্চা হলেও তা কখনোই আন্তরিক ছিলো না। সারা দেশে আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার প্রাণশক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

বাংলাদেশের গণমানুষের লড়াই ও ছাত্র নেতৃত্বের ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পর্কে জাতীয় নাগরিক পার্টি ও ছাত্র নেতৃত্বের পরিষ্কার ধারণা না থাকায় মূলধারার রাজনৈতিক দল হিসেবে ফাংশন করতে গিয়ে অচিরেই তারা গণবিরোধী শক্তির উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রাজনীতি চালাতে তারা দেশীয় লুটেরা মহাজন অলিগার্কদের টাকার উপরে নির্ভর করতে শুরু করে। সরকারের অংশীদার ছাত্র নেতৃত্ব গণবিরোধী আমলাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে তাদের সাথে নিজেরাও গণবিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হয়ে ওঠে।

ফলশ্রুতিতে ছাত্রনেতৃত্ব ও তাদের দলের পক্ষে সত্যিকার অর্থেই গণপরিষদ ও নতুন সংবিধানের দাবিতে লড়াই গড়ে তোলা কঠিন হতে শুরু করে এবং এই দাবিগুলো কথার কথায় বা কৌশলগত রাজনৈতিক বক্তব্যে পরিনত হতে শুরু করে।

এই সময়ে সরকারে থাকা ছাত্র নেতৃত্বের সরকার থেকে বের হয়ে এসে দলে যুক্ত হওয়া এবং দলের মধ্যে একটি শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে তাকে সত্যিকার বিপ্লবী সংগঠনে পরিনত করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্র নেতৃত্ব কাজ করছে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু এই ক্রান্তিকালীন সময়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তথা এক দফা বাস্তবায়নের লড়াই থেকে সরে এসে ছাত্র নেতৃত্বের মূল অংশটি আপোষকামী হয়ে ওঠে এবং বৈদেশিক শক্তি, দেশীয় অলিগার্ক ও আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী, এমপি হওয়ার খায়েশ চরিতার্থ করতে তারা অচিরেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সকল প্রকার উদ্যোগ ত্যাগ করে নির্বাচন কেন্দ্রীক জোট রাজনীতিতে মনযোগ দেয় এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত সকলকে নিয়ে আপোষকামী গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রহীনতা, গণবিচ্ছিন্ন পার্টি পলিটিক্সের ধারায় সাধারণ কর্মী ও অসাধারণ নেতার ক্যাটাগরিতেই দল ফাংশন করানো থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে ছাত্র নেতৃত্বের প্রধান অংশটির অবচেতনে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেয়ার চেয়েও পুরোনো প্রতিষ্ঠিত এলিট গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদদের রিপ্লেস করে নতুন এলিটে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে।

নতুন এই রাজনীতিবিদদের কথায় এবং মননে উঠে এসেছে যে রাজনীতি তাদের কাছে একটি 'জেনারেশনাল ফাইট' অথবা প্রজন্মগত যুদ্ধ; যা একেবারেই সঠিক। নতুন আপোষকামী রাজনৈতিক স্বত্ত্বা তৈরী হওয়ায় পুরোনো প্রজন্মের আপোষকামী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে প্রতিযোগিতা তৈরী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু পুরোনো বুড়ো জালেম হটিয়ে নতুন তরুণ জালেম পাওয়ার মধ্যে জনগণের কোনো লাভ নেই। তাই রাজনীতি ও নির্বাচনে তরুণ এক ঝাঁক প্রার্থী হাজির হলেও এটি দেশের গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির কোনো চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না।

নতুন বন্দোবস্ত = নতুন প্রজন্মের আপোষকামী রাজনীতিবিদ + আমলাতন্ত্র + অলিগার্ক + বৈদেশিক আনুকূল্য = নতুন মোড়কে পুরোনো জালেমি ব্যবস্থা

এটিই মূলত 'নতুন বন্দোবস্তে'র মূল মর্তবা; পুরোনো এলিটকে অপ্রাসঙ্গিক করে নতুন এলিটদেরকে দিয়ে সেই একই শাসন-শোষনের ব্যবস্থা সাজিয়ে নেওয়া; তার বেশি কিছুই নয়।

ছদ্ম বিকল্প: আরোপিত আদর্শিক ধারা (False Alternative: Imposed Ideological Political Stream)

আরোপিত আদর্শিক ধারা হিসেবে আমাদের অঞ্চলে দুই ধরনের রাজনীতি মূলত প্রচলিত। একটি হচ্ছে বামপন্থী পার্টি কেন্দ্রীক রাজনীতি এবং অন্যটি আধুনিক পার্টি ফরমেশন কেন্দ্রীক ইসলামপন্থী রাজনীতি। এই রাজনৈতিক ধারাগুলোকে ছদ্মবিকল্প বলার কারন এগুলো মূলধারার রাজনীতির বিকল্প হিসেবে এবং অনেকক্ষেত্রেই বিপ্লবী হিসেবে নিজেদের হাজির করলেও মূলত এটি একটি ছদ্ম পরিচয়। এই ধারাটি আদতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের

লড়াইকে বুঝতে বা সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অক্ষম। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সত্যিকার পথ বুঝতে এই দুইটি ধারা নিয়েই বিশ্লেষণ অতীব জরুরি।

প্রতিষ্ঠিত পার্টি কেন্দ্রীক বাম রাজনীতি (Established Party Centered Left)

বাংলায় বাম রাজনীতির সূত্রপাত ইউরোপীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে পরিচিত শিক্ষিত বাঙ্গালী উচ্চ বর্ণীয় ভদ্রলোকদের হাত ধরে। তারা কংগ্রেস-মুসলীম লীগ এলিট রাজনীতির বাইরে গিয়ে চাষা-মজুরের রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই অঞ্চলে ইলা মিত্রের মতো বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবেই কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে অশেষ ত্যাগও স্বীকার করেন। কিন্তু সে সময়ের শিক্ষিত উচ্চ বর্নীয় হিন্দুত্ববাদী **“বাঙালি জাতীয়তাবাদ”** কেন্দ্রীক ভাবধারা প্রথম দিককার কমিউনিস্টদেরকেও প্রভাবিত করে।

ফলে এই অঞ্চলে নিপীড়িত চাষা-মজুর সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেও কমিউনিস্টদের গুটি কয়েক বাদে সবাই এই আন্দোলনের বিরোধীতাই করেছেন।

একইভাবে ইউরোপীয় ভাবধারাকে **বাছবিচার** ছাড়া প্রয়োগ করায় অপরিশীলিত নাস্তিক্যবাদ ও সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে এই অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবেই ব্রিটিশ জালেমি কানুনের বিরুদ্ধে স্থানীয় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের বৈপ্লবিক সিলসিলা তারা মূল্যায়ন করতে পারেননি। এই অঞ্চলের স্থানীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনবোধ থেকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরনা সংগ্রহ না করে তাকে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে পশ্চাৎপদ ভাবায় এই ধারা গণমানুষের সাথে প্রথম থেকেই গুরুতর বিচ্ছিন্নতা তৈরী করেছে।

ইউরোপে শ্রমিকের সাথে মালিকের মজুরি নিয়ে দ্বন্দকে কৃত্রিমভাবে কৃষিনির্ভর বাংলায় কল্পনা করতে গিয়ে তারা ফসল ভাগাভাগির তেভাগা আন্দোলনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যদিও সেই একই সময়ে আবুল হাশিম, ভাসানী, যোগেন মন্ডলেরা জমিদার প্রথাই বিলুপ্ত করে দিয়ে জমিতে কৃষকের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার র‍্যাডিকাল বৈপ্লবিক লড়াইকে সংগঠিত করছেন।

চাষা-মজুরের লড়াইকেই কেন্দ্রে না রেখে পার্টিকে কেন্দ্র করে চাষা-মজুরদের সংগঠিত করতে যাওয়ার রাজনীতি প্রচলিত কমিউনিস্টদের গণবিচ্ছিন্নতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। একইভাবে এই দেশের মানুষের যাপিত জীবনের সংগ্রামের চেয়ে প্রায়ই এই রাজনৈতিক ধারার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে গণবিচ্ছিন্ন পিকিং কিংবা মস্কোকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী।

ষাটের দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেনীর হিস্যা বুঝে নেয়ার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবারো বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রীক রাজনীতি গড়ে উঠলে একই সংকীর্ন জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রচলিত বামপন্থীরা হাওয়া দিয়েছেন। চাষা-মজুরের লড়াইকে কেন্দ্রে না রেখে কলোনিয়াল ধারায় শিক্ষিত ছাত্র, সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবি কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতি উগ্র জেনোফোবিক প্রবণতাকে দিয়েছে বৈপ্লবিক ছদ্মবেশ যার **বাতাবরনে** বিহারী গণহত্যাসহ নানা প্রকার অমানবিক অপরাধের মতাদর্শিক পাটাতন প্রস্তুত হয়েছে।

এই হিন্দুত্ববাদনির্ভর বাঙালী জাতীয়তাবাদী আনুগত্য বাংলায় ভারতীয় আধিপত্যবাদের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে তাতেও প্রচলিত বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশের দায় রয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আবারো ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে তৈরী হওয়া অর্থনৈতিক ভাবনাকে বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রচলিত বামপন্থীরা সকল উৎপাদনমূলক কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলার মতো ভুল পদক্ষেপ সমর্থন করেছে। তারা এটি বিশ্লেষন করতে অক্ষম ছিলেন যে রাষ্ট্র তার পতাকা, জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করলেও তা তখনো বৈদেশিক শক্তি, দেশীয় দূর্নীতিবাজ আমলা ও লুটেরাদেরই রয়ে গেছে, তাই কল-কারখানা সব রাষ্ট্রের হাতে দিলে সবই লুট হয়ে যাবে।

উৎপাদনযন্ত্র রাষ্ট্র কর্তৃক দখল করলেই যে তা শোষিত কৃষক-শ্রমিকের কাজে আসবে না বরং কৃষক-শ্রমিকের গণদাবিকে দিয়েই পরিচালিত হবে এমন নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে সেটি প্রচলিত বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশই বোঝেন নি।

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের গুরুত্ব কিছু বামপন্থী গ্রুপ বুঝলেও তারাও মুক্ত ছিলেন না আক্ষরিক আদর্শবাদ থেকে। মার্ক্সবাদের আক্ষরিক তাফসীর নিয়ে বিভেদ এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাক্তিগত বিভেদ থেকেও বামপন্থী গ্রুপগুলো প্রায়শই একের পর এক ভাগে বিভক্ত হয়ে শক্তিক্ষয় করেছে কিংবা জড়িয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয় আত্মঘাতী সহিংসতায় যা এই রাজনৈতিক ধারাকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমান্বয়ে বর্ধমান গণবিচ্ছিন্নতার দিকে।

নব্বইয়ে সোভিয়েত পতন ও কোল্ড ওয়ারের অবসানের পরে বাংলাদেশের প্রচলিত বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এনজিওবাদীতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সফট পাওয়ার নির্মানে কাজ করতে থাকেন যদিও তাদের জাতীয়তাবাদী ধাঁচ, ইউরোপ কেন্দ্রীক ভাবনা, আদর্শিক আক্ষরিকতাবাদ সহ অনেক সমস্যারই কোনো সমাধান হয় নি। **বরঞ্চ স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে** পশ্চাৎপদ ধরে নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা গুটি হয়েছেন নয়া সাম্রাজ্যবাদী নানা প্রকল্পের।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অকুণ্ঠ সমর্থন, শাহবাগ আন্দোলনের মূল মতাদর্শিক বাহন হওয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের সমর্থকগোষ্ঠীতে পরিনত হওয়ার মতো লজ্জাজনক পরিনতি হয়েছে প্রচলিত বামপন্থী শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশের। ফলে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে প্রচলিত বামপন্থীদের সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত অবদান অন্যান্য রাজনৈতিক ধারার তুলনায় খুবই যৎসামান্য।

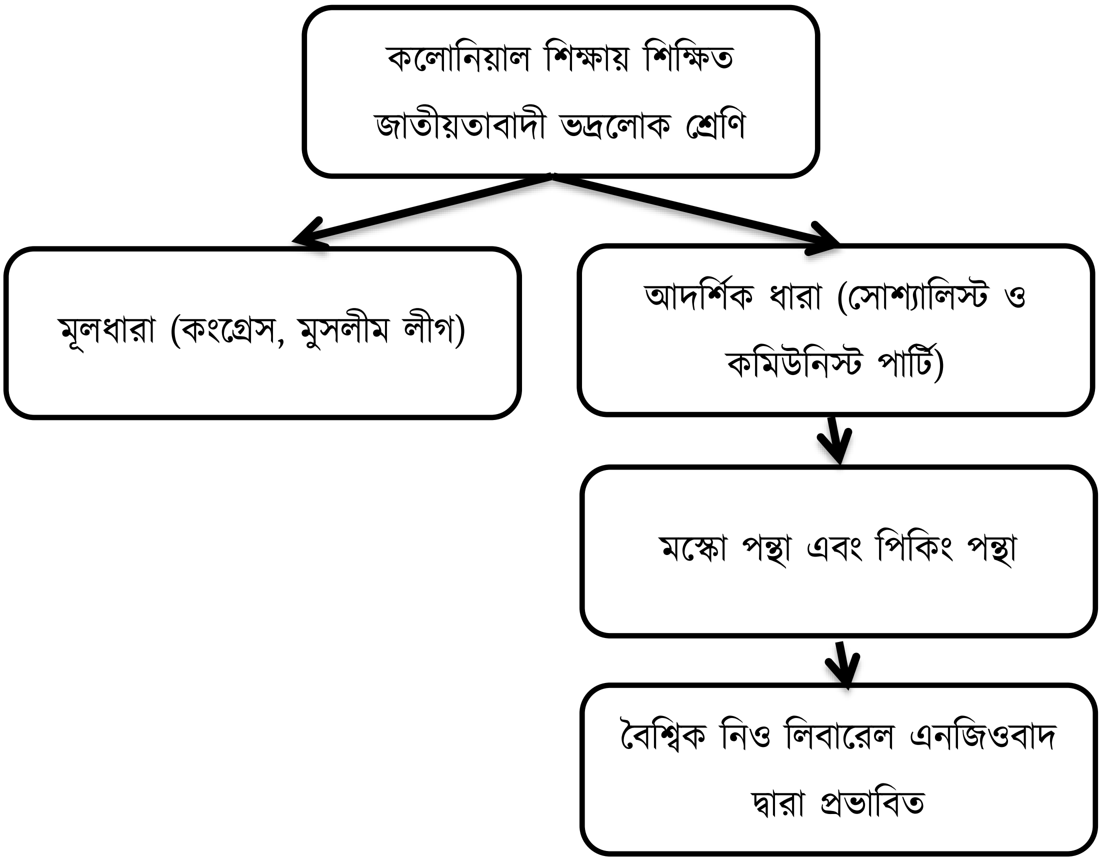

বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, ভারতীয় ও আমেরিকান নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সহ আরো নানা ঐতিহাসিক সংগ্রামে গুরুত্বপুর্ন ও অনেকক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা থাকলেও স্থানীয় গণমানুষের যাপিত জীবনের রুটি, রুজি আর ইজ্জতের সংগ্রামে শিকড় গেড়ে এই ধারাটি গড়ে না ওঠায় এটি শেষ পর্যন্ত গণবিচ্ছিন্নই রয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে এই গণবিচ্ছিন্নতা অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করলেও এই ধারার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীগণ যথাযথ বিস্তারিত আত্মসমালোচনা ও পর্যালোচনা না করেই রাজনীতি অব্যাহত রাখছেন। কিন্তু শুধু ব্যানার পরিবর্তন ও নতুন নতুন সংগঠন/পার্টি গঠন করলেই এই ধারার সংকট কাটবে না যতোক্ষণ না পর্যন্ত গণমানুষের সাথে এই ধারার বিচ্ছিন্নতার কারণগুলো নির্মোহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসন না করা হবে।

প্রতিষ্ঠিত পার্টি কেন্দ্রীক ইসলামপন্থা (Established Party Centered Political Islam)

ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের যুগে অধিকতর উন্নত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির মুখোমুখী হয়ে অটোমান সাম্রাজ্য সহ মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিসমূহ অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখী হয়। বিশেষ করে নেপোলিয়নের মিশর আক্রমন ও অনায়াসে মামলুক এবং অটোমান বাহিনীকে পরাজিত করার ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে এই সংকট তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলে।

এই সময়ে মুসলমান সমাজে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও রাজনীতি অনুকরণ করে নিজেদের ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সমকক্ষ করে তোলার প্রবণতা থেকে সংস্কারবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই ধারা থেকেই পরবর্তীতে তরুণ তুর্কী আন্দোলন এবং কামাল পাশার কর্তৃত্ববাদী ইউরোপীয় মডেলের আধুনিকায়ন তুর্কিতে বাস্তবায়িত হয়।

অন্যদিকে এই আধুনিক সংস্কারবাদী প্রবনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসলাম ধর্মের মূলে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন হিসেবে ওয়াহাবি আন্দোলন গড়ে ওঠে যা আমাদের দেশে তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দেওবন্দী ধারার লড়াইয়ের জন্ম দেয়। **কিন্তু মুসলিম সমাজে যারা ইসলাম, স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এবং আত্মপরিচয় নিয়ে সংবেদনশীল অনেকেই ছিলেন যারা অচিরেই বুঝতে পারেন যে পরিবর্তিত বিশ্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার স্বার্থে আধুনিকায়ন অত্যাবশ্যক কিন্তু এই আধুনিকায়নের সাথে ইসলামকে সঙ্গতিপূর্ণ করে না তুললে সমাজে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের স্বকীয় প্রভাব একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে**।

কর্তৃত্ববাদী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখী হয়ে আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগা বাংলার শিক্ষিত শ্রেনী যেভাবে ইংরেজ জাতির মতোই একটি বাঙ্গালী জাতি গড়ে তুলে স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে আত্মমর্যাদা অর্জন করতে চাচ্ছিলো ঠিক তেমনি **জুডিও-খ্রিস্টীয়** সভ্যতার ধারক ও বাহক ইউরোপের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের মুখোমুখী হয়ে বৈশ্বিক মুসলমান সমাজের শিক্ষিত শ্রেনীর মধ্যেও আধুনিক সভ্য ইউরোপের মতোই ইসলামকে কেন্দ্র করে একটি আধুনিক বৈশ্বিক সভ্যতা নির্মানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। **রশিদ রিদা, জামালউদ্দীন আফঘানীর মতো চিন্তকরা এই প্যান-ইসলামিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন**।

ইউরোপের মতোই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হলে মুসলমান সমাজে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর আদলেই গড়ে তুলতে হবে এই ধারনাটি এই আন্দোলনের মধ্যেই সুপ্ত ছিলো। ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্রগুলো সেসময়ে ছিলো এক ভাষা ও জাতি পরিচয়ভিত্তিক (ইংলিশ-ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ-ফরাসি ইত্যাদি)।

এই মডেল অনুযায়ী বৈশ্বিক মুসলিম সমাজে তুর্কি, আরবি, উর্দুর মতো ভাষা ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতি পরিচয় ভিত্তি করে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একইসাথে আরবে ওয়াহাবি আন্দোলনও ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য তথা ইসলামিক খেলাফত পরাজিত হলে তুর্কিতে কামাল পাশার নেতৃত্বে একেবারেই ইউরোপীয় মডেলের অন্ধ অনুকরণ বাস্তবায়িত হয়; তুর্কি ভাষা ও জাতি-পরিচয় কেন্দ্রীক আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে রাজনৈতিক পরিসর থেকে পুরোপুরিভাবে নির্বাসিত করা হয়। অন্যদিকে আরবে ওয়াহাবি আন্দোলন সফল হয় এবং আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র মডেলের বিরোধী সালাফি মতে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক রাজতান্ত্রিক সৌদি আরব গঠিত হয়।

মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক শ্রেনী ইউরোপীয় শাসনের কিংবা আধিপত্যের অধীনে থেকে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ রপ্ত করেছিলো কিন্তু আবার একইসাথে ঔপনিবেশিক শক্তির বিপরীতে

নিজেদের পরিচয়ের নির্ধারক হিসেবে ইসলাম এবং মুসলমানিত্বকেও গুরুত্ব দিয়েছিলো। ফলে এই অঞ্চলের শিক্ষিত মুসলমান শ্রেনী আধুনিক জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধের কোনোটিকেই সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারছিলো না।

এই দুই ভাবাদর্শের সমন্বয়ের প্রয়োজন থেকে আরবে, বাংলা ও পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম পরিচয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের এক ভাষা ও জাতি পরিচয় কেন্দ্রিক রাষ্ট্র কায়েমের আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়।

আরবে এটি বা'থ বা পুনর্জাগরন আন্দোলনে রূপ নেয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে ওঠে। বা'থ আন্দোলন ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে আরব জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অংশ এবং আরব পরিচয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্য করে তোলে। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি মুসলমানদেরকে হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শেরও মোকাবেলা করতে হয় ফলে উর্দুভিত্তিক এক ভাষা কেন্দ্রীক ইউরোপীয় স্টাইলের রাজনৈতিক ধাঁচ থাকলেও ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় পাকিস্তান আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এই মতাদর্শকে কেন্দ্র করে আধুনিক মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তান জন্ম লাভ করে।

এই রাজনৈতিক মতাদর্শে গঠিত রাষ্ট্রের অন্যতম সমস্যা ছিলো যে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো, বাজার ব্যবস্থা, শেয়ার মার্কেট, আদালত এইসবই ছিলো ইসলামের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক ইউরোপীয় মডেলের কিন্তু আবার একইসাথে এই রাষ্ট্রগুলো ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবেও দাবি করতে থাকে।

সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও মতাদর্শের সাথে বাস্তব জীবনে যাপন করা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচার, আচরণে সাংঘর্ষিকতা তৈরী হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম প্রিয় সমাজে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকেও ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার চাহিদা তৈরী হয়। এই চাহিদা থেকেই ইউরোপীয় মডেলের রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামকে ফিট করে নিয়ে পূর্নাঙ্গ ইসলামী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন গড়ে ওঠে।

এই অঞ্চলে এই রাজনীতিই মওলানা মওদুদীর তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী এবং একই মডেলের দলগুলোর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে নিহিত ইসলামবিদ্বেষ মোকাবেলায় এবং ইসলামের বেশ কিছু **উন্নততর নৈতিক মডেলকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের মতো ইতিবাচক বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই আন্দোলনগুলো ভূমিকা রাখে**।

এক ভাষা, পরিচয়, আইন ও অর্থনীতি নির্ভর আধুনিক ইউরোপীয় মডেলের রাষ্ট্রকে **বাই ন্যাচার** অনেক ক্ষেত্রেই কোনোভাবেই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা সম্ভবপর না। ইসলাম ভাষা ও জাতি পরিচয়ভিত্তিক এককেন্দ্রীকতাকে নিরুৎসাহিত করে নানা জাতি, ভাষার মধ্যে বিশ্বাস ও চুক্তিভিত্তিক সামাজিক (Community Based) উম্মাহর ধারনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। ইসলামে শরীয়াহ আধুনিক ইউরোপীয় আইনের মতো সর্বক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য একক আইন ব্যবস্থা নয় বরং ইসলামী শরিয়াহতে মাজহাব, উসুলভিত্তিক বৈচিত্র্য ও ভিন্ন ভিন্ন আইনগত মানদন্ডের মধ্যে জ্ঞানগত সমন্বয়ের একটি ঐতিহ্য রয়েছে।

একইভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম যে ধরনের মতাদর্শিক মানদন্ড নির্ধারন করে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মডেল তাকে কোনোভাবেই গ্রহন করতে সক্ষম নয়। সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপীয় মডেলের রাষ্ট্রের ছাঁচে ইসলামকে ফিট করতে গিয়ে এই রাজনৈতিক ধারায় আধুনিক রাষ্ট্রটিই হয়ে ওঠে খোদা, যা ইসলাম কী এবং কেমন তা নির্ধারণ করে দেয়।

আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র মডেলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে ইসলামকে ফিট করতে গিয়ে পার্টি কেন্দ্রীক ইসলামপন্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামকেই কাট ছাট করে ফেলেছেন এবং তা করতে গিয়ে গুরুতর রাজনৈতিক ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধের দায় তাদের ঘাড়ে চেপেছে।

ইউরোপীয় আধিপত্যের মুখোমুখি মুসলিম সমাজ

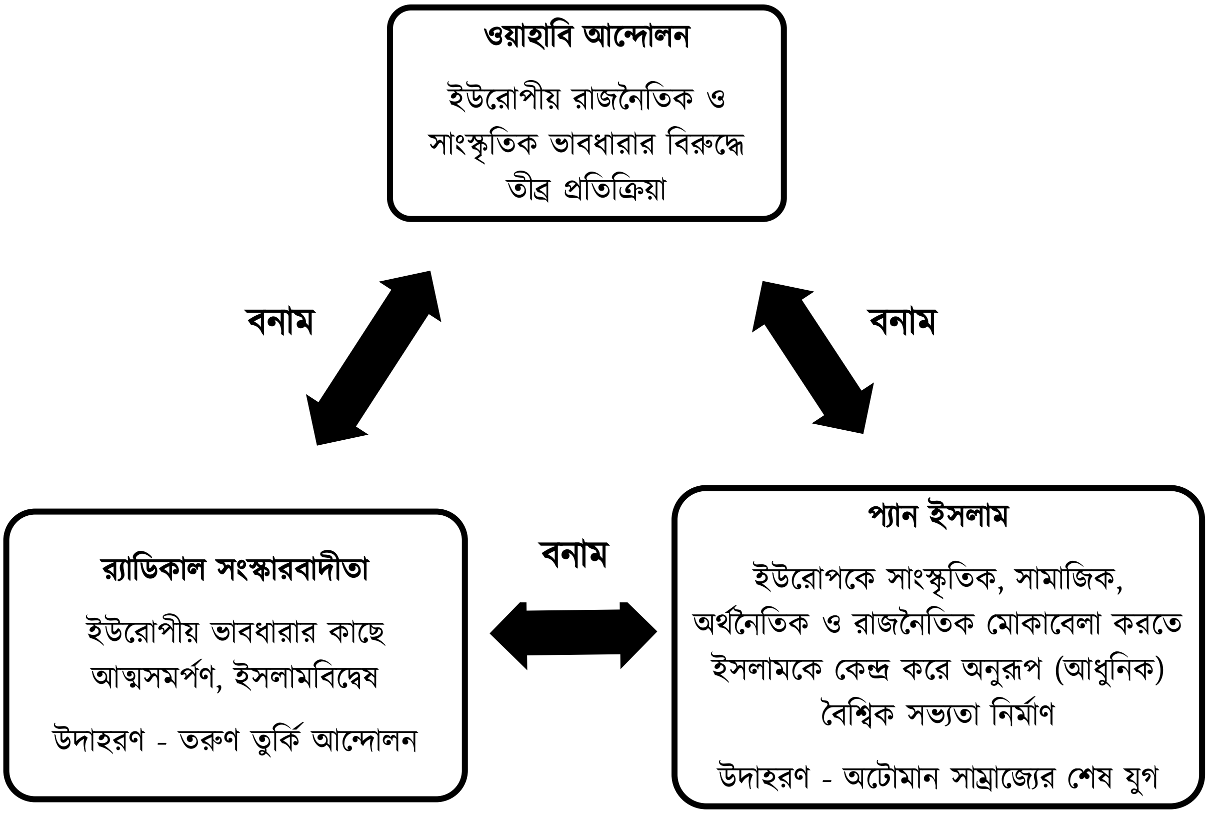

অটোমান সাম্রাজ্য/খিলাফত ব্যবস্থার অবসান

র‍্যাডিক্যাল সংস্কারবাদীতার বিজয় (আধুনিক তুরস্ক, বিপ্লবের পূর্বে ইরান)	**ওয়াহাবি বাদশাহী/আমিরাত প্রতিষ্ঠা** (সৌদি আরব, আরব আমিরাত...)
মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদী ইসলামী ভাবধারা ইউরোপীয় এক ভাষা ও জাতি পরিচয় কেন্দ্রিক রাষ্ট্র, সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, মুসলিম পরিচয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা (আরব বা'থিস্ট সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান আন্দোলন আমাদের দেশে বিএনপির মধ্যে এই প্রবণতা দৃশ্যমান)	**গণবিচ্ছিন্ন ইসলামপন্থা** ইউরোপীয় এক ভাষা ও জাতি পরিচয় কেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা (মুসলিম ব্রাদারহুড, জামায়াতে ইসলামী)

রাষ্ট্রকাঠামোয় ইসলাম ফিট করে নেয়াটাই এই ধারার লক্ষ্য হওয়ায় তারা ভারতীয় রাষ্ট্র ভেঙ্গে নতুন আরেকটি রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বুঝতে সক্ষম হয় নি। আবার পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পরে এই অঞ্চলে এক ভাষাভিত্তিক ইউরোপীয় মডেল চাপাতে গিয়ে উর্দু ভাষা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে এই রাজনৈতিক ধারাটি। আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মডেল, প্রধান ভাষা ও জাতি পরিচয়ের বাইরের অন্যান্য প্রান্তিক ভাষা-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি চরিত্রগতভাবেই ছিলো বৈষম্যমূলক, নির্যাতনমূলক অনেকক্ষেত্রেই যা গণহত্যায় রূপ নিয়েছে।

একইভাবে ঐ মডেলের পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রান্তিক জাতি পরিচয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক কাঠামোকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে রক্ষা করতে গিয়ে এই রাজনৈতিক ধারাকে একাত্তরে হিন্দু ও বাঙালি, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর গণহত্যার মতো ঘটনায় সম্পৃক্ত হতে হয়েছে। এই রাজনৈতিক ধারা তাই সুনির্দিষ্ট নৈতিক মানদণ্ড ধারণকারী 'মুসলিম' এর পরিবর্তে উৎপাদন করে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার মানদণ্ডে আচরনকারী বাইরে থেকে দাড়ি, টুপী ও ইসলামি পরিভাষা ধারণকারী স্ববিরোধী মুসলমান।

উপরন্তু পাকিস্তানে এবং বর্তমান বাংলাদেশে যে রাষ্ট্রটি রয়েছে তা বাইরে বাইরে ইউরোপীয় মডেলের হলেও তা ইউরোপীয় দেশগুলো কিংবা তুর্কির মতো স্বকীয়-স্বাধীন কাঠামো নয়। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ উপনিবেশ যে রাষ্ট্র রেখে গিয়েছে তা বৈদেশিক প্রভু নির্ভর, দুর্নীতিবাজ আমলা ও লুটেরা মহাজন কেন্দ্রীক গণবিরোধী শক্তির স্বার্থ উদ্ধারের যন্ত্র ।

তাই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের অংশ হয়ে এই ধারাটিও বৈদেশিক শক্তিগুলোর সাথে আপোষরফা করেছে। ক্ষমতার অংশ হয়ে সহাবস্থান করেছে আমলা, মহাজন নির্ভর গণবিরোধী শক্তির সাথে। শাসন-শোষণের এই কাঠামোয় ইসলাম ফিট করতে গিয়ে পার্টি কেন্দ্রীক ইসলামপন্থীরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, রোজা রাখা আর হজ্ব করা ঘুষখোর আমলা, লুটেরা মহাজন তৈরী করতে পারলেও দুর্নীতি, শোষণ ও বিদেশি তাবেদারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর প্রতিরোধ তৈরী করতে পারেনি।

হেকমতের নামে এইখানে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক আচরনকে আলাদা করা হয় ইসলামের বৈপ্লবিক নির্যাস থেকে যা সকল জুলুমকে ভেঙ্গে চুরে দিতে চায়। ইসলাম যেইখানে নারী, প্রকৃতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রশ্নে ইউরোপিয়া রাষ্ট্র ও রাজনৈতিকতার চেয়ে অনেক প্রাগ্রসর সেখানে আধুনিক রাজনৈতিক পরিসরকে ইসলামীকরণ করতে গিয়ে পার্টি ইসলামপন্থীরা ইসলামকে এইসকল প্রশ্নে টেনে পশ্চাৎপদতার দিকে নিয়ে গিয়েছে।

নব্বই পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা নিও-লিবারেল শক্তির ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের বিরুদ্ধে লড়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভিক্টিম হয়ে এই ধারাটি ব্যাপকভাবে দমন পীড়ন, গুম, খুনের স্বীকার হয়। এখন এই আত্মত্যাগের উপরে দাঁড়িয়ে নতুন করে এই ধারাটি রাজনীতিতে আদর্শিক একটি বিকল্প দেখাতে চাচ্ছে।

এই ধারাটির রাজনীতি মূলগত জায়গায় ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় মডেলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মুক্তির পথ আমাদের দেখাতে পারে না। বরং স্ববিরোধীতায় কন্টকাকীর্ণ ও অবধারিত রাজনৈতিক ভুলের বাহন হিসেবে এই রাজনৈতিক ধারা আসলে বিভ্রান্তি উৎপাদন করতেই সক্ষম কেবল।

একমাত্র সৎ ও আন্তরিক আত্মপর্যালোচনা ও স্ববিরোধীতা নিরসনের মধ্য দিয়েই এই রাজনৈতিক ধারা সত্যিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রাজনীতিতে পদার্পন করতে পারবে।

২৪ পরবর্তী আদর্শিক ধারা (Post 24 Ideological Stream)

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে নানা আদর্শিক অনুপ্রেরণা নিয়ে সমাজের অনেক অংশই অংশগ্রহণ করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রক্তের অক্ষরে সকল মত, পথ, পরিচয়ের মানুষের ঐক্যবদ্ধ যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তার সাথে আলাদা আলাদা আদর্শিক রাজনীতির যতোটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকুকেই "জুলাইয়ের আদর্শ" হিসেবে চিহ্নিত করা যায় আর তার বাইরের যে আকাঙ্ক্ষাটুকু সারা দেশের সকল লড়াকু ছাত্র-জনতা ধারণ করে না বরং সেই বিশেষ আদর্শিক গোষ্ঠীগুলোই কেবল ধারণ করে সেটি কেবল ঐ গোষ্ঠীগুলোর গোষ্ঠীগত দাবি; জুলাইয়ের মধ্য দিয়ে হাজির হওয়া কোনো জাতীয় দাবি নয়।

এই জন্যেই জুলাইয়ের আন্দোলনে অংশগ্রহনকে পুঁজি করে বা জুলাইয়ের চেতনার দোহাই দিয়ে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা অন্য গোষ্ঠীর জান-মালের উপরে আক্রমণ, নারীর উপরে বিধিনিষেধ আরোপ কিংবা একইভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দাবি জানানো কিংবা নিও-লিবারেল মতাদর্শকে জুলাইয়ের মোড়কে সাজানো গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ যে যে কমন লক্ষ্য সামনে রেখে গণঅভ্যুত্থানের আপামর সেনানীরা রাজপথে নেমেছিলো তার মধ্যে ঐ সকল কাজ করতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দৃশ্যমান নয়। ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে এক দফা অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের বিলোপ ও নতুন বন্দোবস্ত কায়েমই জুলাইয়ের বৈধ গণআকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু, এই যে জুলাইয়ের পরবর্তী সময়ে 'নতুন বন্দোবস্ত' হয়ে দাঁড়ালো পুরনো এলিট হটিয়ে নতুন এলিট হয়ে ওঠার সংগ্রামে তাতে করে এটিই স্পষ্ট হয় যে জুলাইয়ের আদর্শিক প্রতিজ্ঞা নিয়ে আরো কাজ হওয়া উচিৎ ছিলো এবং জুলাইকে কেন্দ্র করে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আদর্শের চর্চা হওয়া প্রয়োজনীয় ছিলো যা নতুন বন্দোবস্তকে শুধু বাইর থেকে নতুনত্ব হিসেবে নয় বরং জুলুম-শোষণ থেকে ইনসাফ ও সাম্যের ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাই জুলাই পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন আদর্শিক রাজনীতির উত্থান অবশ্যই ইতিবাচক।

জুলাই পরবর্তী ডানপন্থী আদর্শধারী প্ল্যাটফর্মগুলো অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার মতো নৈতিক প্রশ্নে জোর দিয়ে চব্বিশ থেকে উঠে আসা আপোষকামী রাজনৈতিক ধারাকে শক্তিশালীভাবে চেপে ধরতে পেরেছে। একই সাথে ইসলামোফোবিয়া ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ প্রশ্নে তারা দৃঢ় অবস্থান গ্রহন করতে পেরেছে।

চব্বিশের সর্বাত্মক গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাবে এই ধারায় আদর্শিক গোঁয়ার্তুমি পুরনো আদর্শিক গ্রুপগুলোর চেয়ে অনেকক্ষেত্রেই কম দেখা গিয়েছে এমনকি সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারী প্রশ্নে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি দৃষ্টিভঙ্গী চব্বিশ থেকে উঠে আসা ডানপন্থী আদর্শিক ধারার প্ল্যাটফর্ম ও মঞ্চগুলোতে দেখা গিয়েছে যা ইতিবাচক

অগ্রগতি অবশ্যই (যদিও এই পরিবর্তন কতোটুকু আন্তরিক আর কতোটুকু লোক দেখানো তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে)।

কিন্তু আধুনিকতাবাদী ইসলামপন্থার স্ববিরোধীতা ধারন করা, সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই গণতন্ত্র মনে করা এবং চব্বিশকে খুবই ধৃষ্টতামূলকভাবে কেবল শুধু তাদের আদর্শিক ক্যাম্পেরই পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করার মতো গুরুতর ভ্রান্তি নতুন আবির্ভূত ডানপন্থী আদর্শিক ক্যাম্পে দেখা গিয়েছে। গণপরিষদ, নতুন সংবিধানের মতো বৈপ্লবিক দাবি আদায়ে তাদের জড়তা তাদেরকে মূল ধারার আপোষকামী ছাত্র নেতৃত্বের মতো অবস্থানে নিয়ে ফেলেছে।

মূলত এই ধারাটি দিনশেষে পুরোনো ডানপন্থী আদর্শিক ধারা থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ইনক্লুসিভিটি প্রদর্শন করলেও মূলগতভাবে তা থেকে আলাদা হতে পারেনি বরং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে রাখা অবদান নিয়ে এদের মধ্যে বিশেষ উন্নাসিকতা ও অহমিকা কাজ করছে যা পুরোনো ডানপন্থী আদর্শিক ধারায় অনুপস্থিত।

অন্যদিকে চব্বিশ থেকে উঠে আসা মধ্য-বাম বা বামপন্থী ধারার মধ্যে কাঠামোগত সহিংসতা ও শোষণের ব্যবস্থা নিয়ে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রান্তিক, সংখ্যালঘু কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি এবং খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মৌলিক অধিকারকে নতুন বন্দোবস্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দেখতে পারাটাও এদের অগ্রগামীতার লক্ষণ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয়, মার্কিন দুই ধরনেরই আধিপত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারাটাও এদের পরিনত চিন্তার লক্ষণ, যদিও এই অংশের ভারতবিরোধিতা নিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। লুটেরা অলিগার্কদের বিরুদ্ধে ব্যাবসায়ী ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে এদের মধ্যে সচেতনতা রয়েছে যা পুরোনো বামপন্থী ধারা এখনো পুরোপুরি গ্রহণ করে উঠতে পারে নি।

তারা বাহাত্তরের সংবিধানের পরিবর্তে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে ফোকাস করেছে যা অবশ্যই কলোনিয়াল আইনী ব্যবস্থার বিপরীতে গণলড়াইয়ের প্রাধান্যকে নির্দেশ করে, পুরোনো বামপন্থী ধারা থেকে যা তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এছাড়াও নদী ভিত্তিক জীবন-জীবিকা ও পরিবেশকে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করার প্রচেষ্টা এই ধারাকে অন্যান্য আদর্শিক ধারার তুলনায় গণমানুষের যাপিত জীবনের আরো কাছে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, মধ্য-বাম বা বামপন্থী এই নতুন ধারাটি সরাসরি বাহাত্তরের সংবিধান ও ঔপনিবেশিক কাঠামোকে উৎখাত করার প্রশ্নে সংস্কারবাদীতার আশ্রয় নিয়েছে যদিও সংস্কার এই সমস্যার কোন কার্যকর সমাধান নয় (পরবর্তীতে

ব্যাখ্যা করা হবে)। একইসাথে এই ধারা প্রচলিত গণবিচ্ছিন্ন দ্বি-দলীয় রাজনীতি ও ছদ্ম গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে।

অর্থাৎ, নতুন এই রাজনৈতিক পক্ষটি গণবিরোধী ধারার প্রকাশ্য গণশত্রুতা এবং গণবিচ্ছিন্ন ধারার বিভ্রান্তিকে একেবারেই চিহ্নিত করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে গণবিচ্ছিন্ন ধারার ক্যামোফ্লাজ এড়িয়ে, গণবিরোধী শক্তিকে উৎখাত করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক রাজনীতি এই নতুন রাজনৈতিক পক্ষটি গড়ে তুলতে অক্ষম।

চব্বিশ পরবর্তী গণবিচ্ছিন্ন আদর্শিক ধারা

ডানপন্থী	বামপন্থী
পুরনো ডানপন্থার চেয়ে ইনক্লুসিভ	ধর্ম-স্থানীয় সংস্কৃতি প্রশ্নে পুরোনো বামপন্থার চেয়ে সংবেদনশীল
পুরনো ডানপন্থার মতোই গণবিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত	গণবিরোধী ও গণবিচ্ছিন্ন ধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও পর্যালোচনার অভাব

চব্বিশ পরবর্তী ডানপন্থী আদর্শিক ধারা যেভাবে পুরনো ডানপন্থার ঘেরাটোপকে মূলগত জায়গায় এড়াতে পারেনি তার তুলনায় নতুন মধ্য-বামপন্থী ধারাটি অবশ্য তার পূর্বসূরী বামপন্থী ধারা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করেছে। তবে দিনশেষে দুটি ধারাই গণবিচ্ছিন্নতার নিগড় এড়াতে পারেনি এবং যথাযথ পর্যালোচনা ও পরিশোধন ব্যাতীত এদের কারো দ্বারাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি সম্ভব নয়।

গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির সার্বিক মূল্যায়ন

মূলত গণবিরোধী শক্তি কর্তৃক আয়োজিত রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ বাটোয়ারা ও ছদ্ম গণতন্ত্রের নাটক মঞ্চস্থে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়েই গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারাগুলোর আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয়। তাই এরা বাইরে বাইরে একেবারেই বিপরীত রাজনীতি করলেও এবং সংঘাতমূলক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে প্রতিটি দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক প্রতিনিয়ত নিহত হলেও এই দলগুলোর নেতারা ক্ষমতার কেন্দ্র গণবিরোধী শক্তির সাথে আঁতাতের কারনে সবসময়েই বেঁচে যায়।

সাতচল্লিশ, একাত্তর, নব্বই, চব্বিশ প্রত্যেকবারই উৎখাত হওয়া এলিট রাজনীতিবিদেরা গণবিরোধী শক্তির মদদে পালিয়েছে, নিরাপদ থেকেছে এবং সময়মতো ফিরে এসেছে বা অবধারিতভাবেই আসবে।

আবার হাজারো প্রশ্নে ছদ্ম বিরোধীতা জারি থাকলেও এই দলগুলোর নেতারা একই প্রক্রিয়ার অংশ হওয়ায় এদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কও তৈরী হতে দেখা যায় অথচ এদেরই অঙ্গুলী হেলনে রাজনৈতিক সহিংসতায় সাধারণ ঘরের প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর, বন্ধু তার বান্ধবের আর ভাই তার ভাইয়ের হত্যাকারীতে পরিনত হয়।

<table>
<tr><th colspan="2">বিদেশী রাষ্ট্র (A)</th><th colspan="2">বহুজাতিক কোম্পানী (B)</th><th colspan="2">বহুজাতিক এনজিও (C)</th></tr>
<tr><td colspan="2">অনৈতিক সুবিধা (বেগমপাড়া...)</td><td colspan="2">অনৈতিক সুবিধা (ব্যাবসায় পার্টনারশিপ...)</td><td colspan="2">অনৈতিক সুবিধা (এওয়ার্ড...)</td></tr>
<tr><td colspan="6">আমলাতন্ত্র + লুটপাটের পার্টনার (দেশীয় মহাজন)</td></tr>
<tr><td colspan="6">তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা /অন্তর্বর্তীকালীন সরকার</td></tr>
<tr><td colspan="2">ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস</td><td colspan="2">ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস</td><td colspan="2">ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস</td></tr>
<tr><td colspan="6">নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনবাদী প্রচলিত রাজনীতি</td></tr>
<tr><td colspan="3">দ্বি-দলীয় মূলধারা
বাঙালি-বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ</td><td colspan="3">দ্বি-মেরু আদর্শিক ধারা
আদর্শিক বাম-আদর্শিক ডান</td></tr>
<tr><td colspan="6">গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারা</td></tr>
</table>

গণবিরোধী আমলাতন্ত্র, লুটেরা অলিগার্ক ও বিদেশী আধিপত্যবাদের ঐক্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত জালেম গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের মজলুম পুর্বপুরুষদের রক্তস্রোত থেকে বহমান ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াই তাই সেদিনই সফল হবে যেদিন গণমানুষ গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির নাটককে উপলব্ধি করে নিজেদের সংগঠিত শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে সরাসরি আঘাত হানবে জুলুমি ব্যবস্থার প্রাসাদে।

গ। গণরাজনৈতিক ধারা

গণরাজনৈতিক ধারা মজলুমের বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা থেকে সরাসরি উৎসারিত। তার স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে এই ধারা বৈপ্লবিক শক্তি ও অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে। এই ধারা মজলুম জনগোষ্ঠীর মধ্যকার স্বতঃস্ফুর্ত সামাজিক সম্পর্কের উপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। লড়াইয়ের ময়দানে সরাসরি মোকাবেলা করে গণবিরোধী জালেম আমলাতন্ত্র, লুটেরা মহাজন আর বৈদেশিক শক্তিকে। লড়াইয়ের কোনো পর্যায়েই এই ধারা গণবিচ্ছিন্ন শক্তির মতো আপোষ-মীমাংসা করে না।

গণরাজনৈতিক ধারা মজলুমের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করে কিন্তু জালেমের সাথে কখনো এক হয় না। এটিই আমাদের নির্যাতিত পূর্বপুরুষদের লড়াই, আমাদের প্রজন্মেরও প্রকৃত লড়াই। এই লড়াইয়েরই সর্বশেষ পর্বে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে আমরা সরাসরি অংশগ্রহন করেছি।

গণরাজনৈতিক ধারা তার ঐতিহাসিক নানা কালপর্বে বিবর্তিত হয়েছে এবং এই বিবর্তন থেকে আমরা আমাদের বর্তমান লড়াইয়ের কী কী রসদ সংগ্রহ করতে পারি, তার বিশ্লেষন অত্যন্ত জরুরী।

প্রত্যক্ষ সশস্ত্র লড়াই: ১৭৬৫- ১৮৫৭ (Direct Armed Struggle: 1765-1857)

বাংলার নওয়াবী অভিজাত শক্তি ১৭৬৪ সালে নওয়াব মীর কাশিমের অধীনে বক্সারের ময়দানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে পরাজিত হলে বাংলায় খাজনা আদায়ের অধিকার হাতে নিয়ে নেয় কোম্পানী। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী খাজনার দেওয়ানী পাওয়ার পর থেকেই বাংলায় তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ জারি হয় যার ফলাফলে সতেরোশো ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রথম কাঠামোগত হত্যার স্বীকার হয়।

কৃষকদের উধ্বৃত ফসল দিয়েই সামাজিক পর্যায়ে ফকির-সন্ন্যাসীদের মতো আধ্যাত্মিক সাধকেরা জীবন নির্বাহ করতেন। বাংলার কৃষক সমাজ এই সময়ে কোম্পানী শাসনের ফলে ধ্বংসের মুখোমুখী হলে ফকির, সন্ন্যাসীগণই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন।

খানকাহ, আশ্রম নির্ভর ফকির ও সন্ন্যাসীদের দলগুলো উত্তরবঙ্গে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে খাজনা আদায়কারী ব্রিটিশ অনুগত আমলা, পাইক, পেয়াদাদের বিরুদ্ধে। কোম্পানী সেনাবাহিনী পাঠালে তাকেও পরাজিত করে ফকির-সন্ন্যাসীগণ। ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক এই বিদ্রোহের কিংবদন্তী।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছাড়াও তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারবাদী আন্দোলন সরাসরি ব্রিটিশ অনুগত জমিদার ও জালেম শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লায় সংঘঠিত লড়াই এই রাজনৈতিক ধারার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ঘটনা।

এছাড়াও কৃষকদের মধ্য থেকেও সরাসরি নেতৃত্ব তৈরী হতে দেখা যায় গণরাজনৈতিক ধারার এই কালপর্বে। নূরলদীনের কৃষক বিদ্রোহ সহ স্থানীয় বেশ কিছু সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এই সময়ে সংগঠিত হয়।

এই কালপর্বের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বৃহৎ বিস্ফোরন ঘটে ১৮৫৭ সালের সিপাহী জনতার মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। পুর্বের ফকির-সন্ন্যাসী, ওয়াহাবি ও কৃষক বিদ্রোহগুলি কেন্দ্রীভূত, উন্নততর ও সংগঠিত ব্রিটিশ-জমিদারী সামরিক শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ কোম্পানীর প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষিত এবং সংগঠিত স্থানীয় সেনা কলামগুলো ব্রিটিশ জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলে কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসন তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই লড়াইয়ের নেতৃত্বে ছিল ক্ষয়িষ্ণু মুঘল আশরাফ শ্রেনী যারা পুঁজিবাদী, আধুনিক ব্রিটিশ কোম্পানীর বৃহত্তর অর্থনৈতিক সক্ষমতা, উদ্ভাবনী সামরিক কৌশল ও উন্নততর সমন্বয়ের কাছে পরাজিত হয়।

বাংলায় ১৮৫৭ এর একশো বছর আগে থেকেই ব্রিটিশ শাসন বলবৎ থাকায় এই অঞ্চলে মুঘল আশরাফ শ্রেনী প্রায় ধ্বংসের শেষ সীমাতেই ছিলো। তাই উত্তর ভারতের মতো এইখানে এই মহাবিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার মতো যথাযথ নেতৃত্ব ও সুযোগ পায়নি, যদিও চট্টগ্রাম সহ বেশ কিছু স্থানে লড়াই হয়েছিলো।

এই লড়াই ব্যর্থ হলেও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত চলমান গণরাজনৈতিক লড়াইয়ের আপোষহীন, সরাসরি মোকাবেলার চরিত্রকে নির্ধারণ করে দিয়েছিলো। ব্রিটিশের বসিয়ে রেখে যাওয়া পুলিশ, কোর্ট-কাচারী আর তার ছোঁড়া তাজা বুলেটের বিরুদ্ধে লাঠি আর গুলতি হাতে নামা স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছাত্রের সাথে আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে বল্লম হাতে যুদ্ধরত ফকির-সন্ন্যাসী কিংবা বাঁশের কেল্লার তালেবে এলেমের কোনো পার্থক্য নেই। এরা সকলেই একই লড়াইয়ের সৈনিক।

বৈশিষ্ট্য	**দূর্বলতা**
স্থানীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, নদী আর মাটির জীবন থেকে উৎসারিত	আধুনিক জ্ঞান, প্রযুক্তি, কৌশল প্রয়োগে অক্ষমতা
নেতৃত্ব পরিবারতান্ত্রিক নয়, যোগ্যতা ও কৌশল কেন্দ্রীক; নেতৃত্ব এক কেন্দ্রীকও নয় বরং বিকেন্দ্রীক	স্থানীক ব্যাপকতা ও সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনার অভাব
সরাসরি গণবিরোধী প্রশাসন, অর্থনীতি ও সামাজিক বিধিনিষেধ ছুঁড়ে ফেলে নিজস্ব সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম	

স্থানীয় অধিকার আন্দোলন ১৮৫৭-১৯০৬

১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ পরাজিত হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার সামরিক শক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে জমিদার, আমলাদের নেটওয়ার্কের উপরে ভিত্তি করে একচ্ছত্র শাসন চাপিয়ে দেয়। ফকির-সন্ন্যাসী, স্থানীয় শিক্ষক, সাধকদের দ্বারা চর্চিত ও স্থানীয় সামাজিক জীবনে যাপিত আইন ও মতাদর্শ যা লড়াইয়ের শক্তি ও বৈধতা যোগাতো তাকে মোকাবেলা করতে রানী ভিক্টোরিয়ার ফর্মান ও ভারত শাসন আইনের অধীনে কোর্ট-কাচারীর আইন-সংবিধান প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এইসময়ে দমনবাদী পুলিশ, থানা এবং আদালত ধীরে ধীরে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ আইন-সংবিধানের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তৈরী করা হয়, বৈধ-অবৈধ রাজনীতির সীমারেখা টানা হয়, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবর্তে দেন-দরবারকে ভদ্র, নিয়মতান্ত্রিক এবং সভ্য রাজনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এই সময়ে স্থানীয় কৃষকেরা অতিরিক্ত খাজনা, জোরপূর্বক নীল চাষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে। কিন্তু এই আন্দোলনগুলো কমিটি, কমিশন ও রিপোর্টের মধ্য দিয়ে সরকারি দেন-দরবারের পরিসরে নিয়ে আসার ঔপনিবেশিক কৌশল প্রয়োগ হতে শুরু করায় নীল বিদ্রোহের মতো কৃষক বিদ্রোহগুলি সীমিত কিছু দাবি আদায়ের বাইরে যেতে পারঢ়নি। তবে দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও সফলতা অর্জন করে গণরাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি প্রজন্ম যারা এই লড়াইয়ের আগুন জীবিত রাখে।

চব্বিশেও গণবিরোধী আমলাতন্ত্র ভেঙ্গে, অলিগার্কদের পতন ঘটিয়ে সত্যিকার জনগণের রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা মাথা জাগিয়ে তুললে নানা প্রকারের সংস্কার কমিশন গঠন করে জুলাই সনদের মাধ্যমে কয়েকটি ছোটোখাটো দাবি দাওয়ায় গণঅভ্যুত্থানের এতো রক্তে লেখা আকুতিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে । এমনকি তাও বাস্তবায়ন না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস ও ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেন-দরবারের দ্বি-দলীয় রাজনীতি সমাজে ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার করলে স্থানীয় সরাসরি প্রতিরোধও পার্টি পলিটিক্সের আপোষ রফা কেন্দ্রীক পর্যায়ে চলে যেতে থাকে। তাই মোটামুটি এই সময়েই এই পদ্ধতির লড়াই থেমে যেতে থাকে।

১৯০৬ সালের পরেও নাচোল, নানকার বিদ্রোহের মতো বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু এই সময় থেকেই দ্বি-দলীয় পার্টি পলিটিক্স ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং সরাসরি আপোষহীন লড়াই সংগঠিত হওয়ার হার কমে এসেছে।

মোমেন্টাম হারিয়ে ফেললেও এই লড়াই এমন কিছু নেতৃত্ব তৈরী করেছিলো যারা পার্টি পলিটিক্সে প্রবেশ করেও গণরাজনৈতিক সিলসিলা ত্যাগ করেননি বরং তাকে মূলধারায় টিকিয়ে রেখেছেন। কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম কৌশল ছিলো তীরের ফলায় আগুন ধরিয়ে তা খড়ের কাচারি ঘরের (যেখানে কৃষকের খাজনা, ঋন সংক্রান্ত দলীলাদি থাকে) চালে নিক্ষেপ করা। এতে দলিলাদি পুড়ে গিয়ে কৃষক খাজনা, ঋন থেকে মুক্তি লাভ করতো।

মুসলীম লীগ থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য, পরে আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা গণনেতা মওলানা ভাসানীর জীবনের প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচি কোনো স্মারকলিপি প্রদান বা গোলটেবিল বৈঠক ছিলো না; তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিলো রাতের অন্ধকারে গেরিলা কায়দায় কাচারি ঘরে আগুন দিয়ে!

বৈশিষ্ট্য	**দূর্বলতা**
স্থানীয় মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে সচেতনতা	রাজনৈতিক বিশ্লেষন ও বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনার অভাব
একান্ত সামাজিক শক্তির উপরে নির্ভর করে টিকে থাকা	বৃহত্তর কেন্দ্রীয়ভূত আন্দোলন গড়ে তুলতে অক্ষমতা
প্রথম কালপর্বে চুড়ান্ত সামরিক পরাজয়ের স্বীকার হওয়ার	গণবিরোধী শক্তির দরবারী ক্ষমতাকে সরাসরি
পরে প্রতিরোধের সিলসিলা জীবিত রাখতে সক্ষম হওয়া	অস্বীকার করতে অক্ষমতা

নিয়মতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলন ১৯০৬-১৯৬৯

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই দলীয় দেন-দরবারের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে চাষা-মজুর-মজলুমের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠতে থাকে। ভোটার হিসেবে তাদের সংগঠিত করে নির্বাচনে আশানুরূপ ফলাফল করবার জায়গা তৈরী হওয়ায় এলিট রাজনৈতিক নেতাগণ গণরাজনৈতিক ধ্যান-ধারনার সংস্পর্শে আসতে শুরু করেন।

এই সময়ে দ্বি-দলীয় গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় সূর্যসেন, ক্ষুদিরামদের সরাসরি সশস্ত্র লড়াই আবির্ভূত হলেও তা গণসম্পৃক্ততা পাওয়ার মতো সক্ষম ছিলো না আদর্শিক সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক পরিবেশগত কারণে। নেতাজী সুভাষ বোস এই ঘরানা থেকে উঠে এসে কিংবদন্তীতে পরিনত হলেও এটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরী করতে পারেনি ঐতিহাসিক কারণে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই খাজনা ও ঋনের দায়ে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির দাবি নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু হয় এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টির মধ্য দিয়ে। এই প্রথম গণরাজনৈতিক ধারা

পার্টি পলিটিক্স দ্বারা প্রশমিত না হয়ে পার্টি পলিটিক্সকেই নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা চালায়। একইভাবে ধীরে ধীরে দরিদ্র মুসলমান ও দলিত অধ্যুষিত চাষা-মজুর শ্রেণির জমির উপরে মালিকানা প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক দাবি নিয়ে জমিদারী প্রথা বাতিল ও পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন তীব্রভাবে জোরদার হতে থাকে মুসলীম লীগের গণসম্পৃক্ত নেতা আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী ও যোগেন মন্ডলদের কেন্দ্র করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার, ছয় দফা, এগারো দফার আন্দোলন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন ঐতিহাসিক মুহুর্তে গণমানুষের দাবি ও চাহিদা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

দাবিভিত্তিক ও ক্রমবর্ধনশীল সাফল্য ও শক্তি অর্জন করলেও এই পর্বে প্রতিটি গণরাজনৈতিক লড়াই চুড়ান্ত মূহুর্তে সবসময় গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার আসার বা সুবিধা নেওয়ার বার্গেইনিং টুল হিসেবে ব্যাবহৃত হয়েছে।

কৃষক-প্রজা আন্দোলন নতুন নতুন মন্ত্রী, এমপি বানালেও ছিচল্লিশের দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারেনি। পাকিস্তান আন্দোলনের ঘি খেয়েছে এলিট নওয়াব, অফিসার, আমলা , লুটেরারা। ছয় দফা দিনশেষে আওয়ামীলীগকে এই অঞ্চলে ক্ষমতাশালী হতে সহায়তা করেছে। লড়াইগুলোর চরিত্র গণরাজনৈতিকই ছিলো এবং তা গণমানুষের চাহিদা ও দাবি নিয়েই সংগঠিত হয়েছিলো, কিন্তু পার্টি পলিটিক্সের নিগড়ে নির্ভরশীল থাকায় লড়াইয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যে জনগণ কখনো পৌছায় নি। লড়াইকে পেছনে রেখে তার প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনার টেবিলে বসে আপোষরফা করে নিজেদের হিস্যা বুঝে নিয়েছে এলিট গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতি।

তবে এই সময়ে গণরাজনৈতিক লড়াই খুবই গুরুত্বপূর্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। খবরের কাগজ, রেডিওর মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একই সংবাদ ও সচেতনতা বিস্তার এই সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে। ব্যাপকভাবে ছাত্র ও শ্রমিক শ্রেনীর বিকাশ, শহরের বিস্তার এবং একইসাথে মিটিং, মিছিল, সভা, সমাবেশ, অবরোধ, হরতালের মতো ব্যাপক গণ-অংশগ্রহণমুলক রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গণমানুষের শাসন, জুলুমের প্রতিবাদ তখন পর্যন্ত ইতিহাসের সর্ববিস্তৃত ও ব্যাপক এক্সপোজার এবং আকার, পেতে থাকে।

বৈশিষ্ট্য	দূর্বলতা
ব্যাপক গণঅংশগ্রহনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া	গণবিচ্ছিন্ন প্রতিনিধিত্বের ফলে এলিট-গণবিরোধী শক্তির আপোষরফার ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হওয়া
যোগাযোগ ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সক্ষমতা	পার্টি কেন্দ্রীক বিভাজন ও সম্প্রদায়-জাতিগত অনৈক্যের স্বীকার হয়ে শক্তিক্ষয়
গণবিরোধী শক্তির কাছে দেন-দরবারে না গিয়ে গণবিরোধী শক্তিকেই নত হয়ে আপোষের পন্থা নিতে বাধ্য করা	

গণঅভ্যুত্থান ও জনযুদ্ধ ১৯৬৯-১৯৭১-২০২৪

আইয়ুব খানের হাত ধরে সরাসরি গণবিরোধী আমলাতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়। বেসিক ডেমোক্রেসির মতো ব্যবস্থার কারণে গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনৈতিক দলগুলোও রাজনৈতিক পরিসরে জায়গা হারাতে থাকে, গণতন্ত্র ও স্বাভাবিক অবস্থার নাটক ফিকে হয়ে আসে; গণবিরোধী শক্তির সাথে গণমানুষের সরাসরি লড়াই-দ্বন্দ্ব তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডিও, খবর, রাজনৈতিক্ দল ও সংগঠন তথা প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক সচেতনতার ব্যাপক বৃদ্ধিতে সকল শর্ত নির্ধারিত হয়ে যায় সারা দেশে অভূতপূর্ব এক গণআন্দোলন সংঘটিত হওয়ার। পুলিশের গুলিতে শহীদের ঝরে যাওয়া রক্ত সারা দেশে একই সাথে তীব্র আবেগ ও লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা যোগায়।

তাই শহীদ আসাদের আত্মত্যাগের পথ ধরে ঊনসত্তরে (১৯৬৯) দুশো বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের ঐক্যবদ্ধ গণঅভ্যুত্থান সফল করে এই অঞ্চলের মজলুমেরা। শহীদ নূর হোসেন আর ডাক্তার মিলন একইভাবে খুলে দেন নব্বই গণঅভ্যুত্থানে দ্রোহের বাঁধ। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই একাত্তরের জনযুদ্ধ সংগঠিত হয়। একাত্তরের যুদ্ধের সাথে সাথেই ভারতীয় আধিপত্য ও আওয়ামী বাকশাল কায়েম হলে জাসদ গণবাহিনী এবং সর্বহারার মতো মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলো অসমাপ্ত জনযুদ্ধ সফল করতে প্রচেষ্টা চালালেও ব্যার্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পুনরায় গণমানুষ আধিপত্যবাদী শক্তিকে মোকাবেলা করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু এতো কিছুর পরেও দুঃখজনকভাবে গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতি ও গণবিরোধী শক্তি টিকে থাকে। নব্বইয়ে অভ্যুত্থানের পরে পরে আবারো গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতির ছায়াতলে আশ্রয় নেয় গণবিরোধী শক্তি। চব্বিশেও গণঅভ্যুত্থানের পরে তাই হয়েছে।

গণঅভ্যুত্থান গণরাজনৈতিক ধারার লড়াইয়ে চুড়ান্ত কালপর্ব, আমাদের মঞ্জিলে মকসুদ। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র লড়াইয়ে কেবল কিছু জায়গায় মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছে, গণবিরোধী শক্তির কেন্দ্র অক্ষত ছিলো। অধিকারভিত্তিক আন্দোলন কেবল গণরাজনৈতিক লড়াইকে প্রাথমিক পরাজয়ের পরে টিকিয়ে রেখেছে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন মিছিল, অবরোধ, হরতালের ভেতর দিয়ে গণবিরোধী আমলাতন্ত্র, পুলিশ, আদালতকে অকার্যকর করে ফেললেও তা চুড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে পারেনি গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে বরং গণবিচ্ছিন্ন এলিট নেতৃত্বের পাল্লায় পড়ে আপোষরফার গোলটেবিলেই লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটেছে।

একমাত্র কেবল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই গণবিরোধী শক্তির পুলিশ, আদালত, বুলেটকে চূড়ান্ত আত্মসমর্পন করানো সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি গণঅভ্যুত্থানই এই ক্ষেত্রে সফল। গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত মূহুর্তে গণবিরোধী শক্তির সকল প্রকার বস্তুগত অনুষঙ্গ, তার বলপ্রয়োগের যন্ত্র, তার বিচার দন্ড, তার প্রশাসন, তার খাজনার দেওয়ানী সব অকার্যকর হয়ে পড়েছে, বিকল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ গণবিরোধী শক্তি মৃত্যুবরণ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এখন কেনো আমরা জনগণের সেবায় নিয়োজিত, গণমানুষের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য রাষ্ট্র গড়তে পারলাম না? মৃত গণবিরোধী শক্তি কি তবে পুনর্জন্ম লাভ করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই হ্যাঁ। পুনর্জন্ম লাভ করেই আবার ফিরে এসেছে গণবিরোধী শক্তি; প্রত্যেকটি গণঅভ্যুত্থানের পরপরেই।

তার কারণ প্রতিটি গণঅভ্যুত্থানের পরেই অসচেতন, অপ্রস্তুত ও অপরিনত নেতৃত্ব গণবিরোধী শক্তির প্রাণভোমরায় আঘাত না করেই বিজয়ের উল্লাসে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো।

ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়ার ফর্মান, গণবিরোধী শক্তির প্রাণভোমরা ১৮৫৮ সালের সেই রাজকীয় দলীলের উত্তরসুরী আমাদের সংবিধান, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের মতো সকল ঔপনিবেশিক আইনকে অক্ষত ও বহাল রাখা হয়েছে। ফলে গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতনের পরের দিন থেকেই আবারও আমাদের পূর্বপুরুষের রক্তে রঞ্জিত থানাগুলোর তালা খুলেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের কালাপানি (নির্বাসন) পাঠানো আদালতের এজলাশ আবারো গমগম করে উঠেছে, প্রশাসনের লাল ফিতা, টেবিলের তলে হ্যান্ডশেক আবার চালু হয়ে গিয়েছে। শুধু টেবিলের পেছনে চেহারাগুলো পরিবর্তন হয়েছে আর আমাদের চোখে ধুলো দেয়া হয়েছে সরকারি স্লোগান আর অন্তঃসারশুণ্য কমিটি, কমিশনের রিপোর্ট দিয়ে।

চব্বিশের রক্তাক্ত এই গণঅভ্যুত্থান বিশেষ এই কারণে যে এই গণঅভ্যুত্থানের পরেই সরাসরি গণপরিষদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র গঠনের দাবি সরাসরি হাজির হয়েছে। গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতি পর্দার পেছনে চলে যাওয়ায় বিভাজন ও আপোষরফার বাইরে গিয়ে মজলুমের বৃহত্তর ঐক্য দৃশ্যমান হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য	দুর্বলতা
গণবিরোধী শক্তির বস্তুগত পরাজয়	সামরিক শাসন অথবা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার অন্তরালে পুরনো আইন-সংবিধান টিকে থাকা
নতুন জনগণের রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ হাজির হওয়া	নির্দেশনার অভাবে ক্ষোভের বিক্ষিপ্ত বহিঃপ্রকাশ, যথাযথ গঠনমূলক কাজের শক্তিক্ষয়

লড়াই এই মুহূর্তে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট। সারা দেশে এই মূহুর্তে চব্বিশের মধ্য দিয়ে তারুণ্যের বিপ্লবী অংশটি আজ জাগ্রত ও প্রস্তুত। গণবিজয়ের মূহুর্তে ঔপনিবেশিক জালেম আইন-সংবিধান, শাসন, ত্রাসন, ছুড়ে ফেলে আমাদের নদী আর মাটির সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা গড়ে তুলব আমাদেরই যাপিত সংস্কৃতির বিপ্লবী সম্ভাবনার পাটাতনে।

আমাদের নির্যাতিত-নিপীড়িত পূর্বপুরুষ এবং শহীদ ভাই-বোনদের রেখে যাওয়া এই লড়াই যারা লড়তে আগ্রহী তারাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী।

গণরাজনৈতিক ধারার সার্বিক মূল্যায়ন

গণরাজনৈতিক ধারার নানা কালপর্বে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, দুর্বলতা ও শিক্ষা যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমরা যারা এই লড়াইয়ের সিলসিলা বহন করি তাদের কৌশল কেমন হওয়া উচিৎ। মূলত গণবিচ্ছিন্ন বিভাজনমূলক এলিট রাজনীতির বিভ্রান্তি এড়িয়ে, সরাসরি গণবিরোধী শক্তিকে মোকাবেলা ও ধ্বংস করে নতুন রাষ্ট্র গঠনই এই লড়াইয়ের কর্তব্য।

বিদেশী রাষ্ট্র	**দক্ষিন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তির লড়াইয়ে সংহতি**
অনৈতিক সুবিধা (বেগমপাড়া...)	সকল দাসত্বমূলক চুক্তি বাতিল
আমলাতন্ত্র + লুটপাটের পার্টনার দেশীয় মহাজন	কমিউনিটি ভিত্তিক স্থানীয় সেবাধর্মী প্রশাসন + বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তা নির্ভর, পরিবেশবান্ধব জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ
তত্ত্বাবধায়ক/অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতার চুক্তি/ডিলিংস	**গণ-বিপ্লবী সরকার** গণআন্দোলসমূহের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত ঐক্য ও কো-অর্ডিনেটেড লড়াই
নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনবাদী প্রচলিত রাজনীতি দ্বি-দলীয় মূলধারা দ্বি-মেরু আদর্শিক ধারা	**স্থানীয় কমিউনিটিভিত্তিক আন্দোলন** মজলুমের বৃহত্তর ঐক্য প্রকৃত আদর্শিক পর্যালোচনা
গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারা	**গণসচেতনতা নির্মান**

গণসচেতনতা নির্মাণ থেকে শুরু করে মজলুম গণমানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের রাষ্ট্র নির্মান এবং সেই রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে বৃহত্তর বৈশ্বিক মজলুমের লড়াইয়ে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়েই সাফল্যের দোরগোঁড়ায় পৌঁছাবে শত শত বর্ষব্যাপী এই সংগ্রাম।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমূহ

কলোনিয়াল ব্যবস্থা উৎখাত করে স্থানীয় সংস্কৃতি কিংবা গণআকাঙ্ক্ষার উপরে ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বেশ কিছু বর্গ আমাদের সমাজে হাজির আছে। তাদের বিশ্লেষনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে পাঠ করলে বর্তমানে একই সংকল্পে গড়ে তোলা লড়াই কিভাবে লড়তে হবে তা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঐতিহ্যবাদী ধারা

গণরাজনৈতিক ধারার অন্তর্গত যে লড়াইগুলো ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখে বর্তমান গণসংগ্রামে মজলুমের পক্ষে হাজির আছে তাদেরকে গণ-বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্যবাদী ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রাক-আধুনিক

১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ফকির-সন্ন্যাসী, আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধকদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রত্যক্ষ সশস্ত্র গণসংগ্রাম মিইয়ে পড়ে। এক সময়ে বিপ্লবী গণরাজনীতির কেন্দ্র খানকাহ, দরগা ও জামেয়াগুলো কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই তৎপর হয়। রক্ষনশীল দেওবন্দী আন্দোলন ও স্থানীয় সামাজিক সমর্থনে পীরালি খানকাহ ও আশ্রমের মধ্য দিয়ে কোনোমতে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় এই ধারা।

ফকির-সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক সিলসিলার অনুসারী পীরের খানকাহ, দরগা কিংবা তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহদের সিলসিলায় কওমী ধারার জামেয়া ও সামাজিক শক্তিকে কেন্দ্র করে কলোনিয়াল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রকার সামাজিক প্রতিরোধ জারি হয় যা আজও অস্তিত্বশীল। এই ধারাটি কলোনিয়াল ব্যবস্থাকে জালেমি ব্যবস্থা হিসেবে কোনো রাখ ঢাক ছাড়াই চিহ্নিত করতে সক্ষম এবং অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্তে তার বিরোধিতাও করতে সক্ষম। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক গণসংগ্রাম গড়ে ওঠার মূহুর্তে ফাতওয়া কিংবা পীরালি হুকুমাত জারির মধ্য দিয়ে এই ধারা গণরাজনীতিকে সামাজিক ভিত্তি ও সমর্থন যোগাড় করে দিয়েছে।

মওলানা ভাসানী, হাফেজ্জী হুজুর সাহেব সহ অনেক শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ন গণনেতৃত্ব এই ধারারই সম্পদ যারা কৃষক আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদ্যয়ের সময়ে গণমানুষের লড়াইকে শক্তিশালী করেছেন; সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভিত্তি প্রদান করেছেন।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে কলোনিয়াল ব্যবস্থাকে উৎখাত করে এই নিও-লিবারেল বিশ্ব ব্যবস্থায় কিভাবে ও কোন প্রক্রিয়ায় ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিশ্লেষন ও রুপরেখা এই ধারায় অনুপস্থিত। ফকির-সন্ন্যাসী

আন্দোলন কিংবা ফরায়েজী আন্দোলনের সময়ে যেসকল দূর্বলতার কারণে এই ধারা পরাজিত হয়েছিলো তার অনেকগুলোই, যেমন - আধুনিক বাস্তবতা অনুসারে বিবর্তিত না হওয়া এবং ব্যাপকতর কর্মপরিকল্পনার অভাব এখনো এই ধারায় রয়ে গিয়েছে।

মূলত ১৮৫৭ এর পরাজয়ের পরে টিকে থাকার যে সংগ্রামে এই ধারাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে করে স্থবিরতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা জেঁকে বসে এই ধারাটিকে বিপ্লবী রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠার সক্ষমতা থেকে ক্রমাগত দূরে নিয়ে গিয়েছে। শাপলা আন্দোলনে ব্যাপক আত্মত্যাগ ও জুলুমের স্বীকার হলেও সকল মজলুম গণমানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো ডাক দিতে কিংবা লড়াইয়ের প্রকৃত পন্থা এই ধারা বাতলাতে পারেনি।

প্রকৃত বিকল্প বিশ্ব ব্যবস্থা ও সভ্যতা কল্পের অভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো একের পর এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিমা নিও-লিবারেল আধিপত্য এবং ইজরাইলের দালালী মেনে নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এইসকল প্রভাব মতাদর্শিক সামঞ্জস্যের কারনে আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাদী ধারাগুলোরও উপরে এসে পড়েছে ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এই ধারার বিপ্লবী সম্ভাবনা। উপরন্তু পশ্চিমা বৈদেশিক শক্তি, তাদের দালাল আমলা ও অলিগার্কদের কবলে পড়ে এই ধারা গণবিরোধী শক্তিকে মোকাবেলা করার বাস্তবিক সক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলেছে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রভাবে নির্বাচনী আপোষ ও দেন-দরবারের সংস্কৃতি এই ধারাকে মূলচ্যুত করেছে। আলেমদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলো ছাড়াও খানকাহ, দরবারগুলোর অনেকেই সরাসরি সহযোগিতা করেছে অথবা আপোষে অধীনতা মেনে নিয়েছে সাবেক আওয়ামী ফ্যাসিবাদের। এছাড়াও পার্টি কেন্দ্রীক হয়ে উঠতে গিয়ে কিংবা পার্টি কেন্দ্রীক ইসলামপন্থার প্রভাবে এই ধারায় প্রবেশ করছে অপরের উপরে কর্তৃত্ববাদীতা ও দমনমূলক আকাঙ্ক্ষা। নিজ কমিউনিটির স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা রক্ষার বদলে অন্যের উপরে জোর করে মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার ফ্যাসিবাদী আকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে এই ধারায় প্রবেশ করেছে।

একইসাথে গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির বিভাজনমূলক প্রভাব এই ধারার কিছু পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই বর্তমান থাকা ফেরকাজনিত কঠোরতাকে নিয়ে গিয়েছে বিপজ্জনক পর্যায়ে; যা মজলুমের ঐক্য গঠনের পরিপন্থী। এই ধারার মধ্যে থাকা ফেরকা কেন্দ্রীক (ধর্মীয় মতাদর্শ) বিভাজন ধারাটির একই উৎপত্তিগত চরিত্রকে আড়াল করে এক শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্থ করেছে এবং আদর্শিক দ্বন্দ্বে শক্তিক্ষয় করার দুষ্টচক্র তৈরী করেছে।

বাংলার স্বকীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে সকল কমিউনিটির মধ্যেই টিকিয়ে রাখা ও বিকশিত করার প্রচেষ্টার অভাবে দেশীয় আশ্রম কেন্দ্রীক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শ এই

শুন্যতার জায়গা নিয়ে বাংলায় ভারতীয় আধিপত্যের মতাদর্শিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর কলোনিয়াল পরিচয়বাদের অবসান না ঘটে তা আরো গভীর হচ্ছে।

এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখ সারিতে থাকা এই ধারাগুলো ৫ই আগস্টের পরে আরো বিভক্ত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়ার চাদরে আশ্রয় নিয়েছে। মূলত গণবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র এবং অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ মদদে এই ধারার অন্তর্গত দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ফেরকাগত দ্বন্দ্ব উস্কে দিয়ে সংঘর্ষ তৈরি করা হয়েছে।

এই ধারার বৈপ্লবিক সামাজিক ভিত্তিকে যদি গণমানুষের বর্তমান সংগ্রামে কাজে লাগাতে হয় তবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যে বৃহত্তর আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্য ব্রিটিশ জুলুমিয়াতের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলো কিংবা ১৮৫৭ সালে হিন্দু, মুসলমান সকল সিপাহীর উচ্চারিত **“খালকে খোদা, মুলকে বাদশাহ, হুকুমাতে সিপাহী”** এর মতো যে স্লোগান কলোনিয়াল জাহেলিয়াতকে প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন করেছিলো, সেই স্মৃতি ও শিক্ষাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে বৃহত্তর মজলুমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বাস্তবতাকে সম্যক উপলব্ধি করে তার প্রেক্ষিতে একেবারে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নিজেদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং ফকির মজনু শাহ, তিতুমীরদের সিলসিলাকে অতীতের চাদরে ঢেকে না রেখে বর্তমানে তাকে হাজির-নাজির করার লক্ষ্যে সৃজনশীল ও গতিশীল পদক্ষেপ গ্রহন করার মধ্য দিয়েই এই ধারার বৈপ্লবিক পুনর্জাগরন সম্ভব।

আধুনিক

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ দ্বি-দলীয় রাজনীতি গণমানুষের প্রত্যক্ষ লড়াই সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে, রাজনীতিকে দেন-দরবারে পরিণত করে ফেলায়, শিক্ষিত-সচেতন তরুণদের মধ্যে যারা মজলুম জনগোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন তারা পার্টি পলিটিক্সের নাটক এড়িয়ে সরাসরি গণবিরোধী ঔপনিবেশিক শক্তিকে মোকাবেলার পন্থা বেছে নেয়। **“অনুশীলন সমিতি”, “যুগান্তর” এর মতো বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে**। ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টারদা সূর্যসেনরা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেন।

পরবর্তীতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এই ধারাকে সংকীর্ণ হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ থেকে বের করে এনে বৃহত্তর মজলুম জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বিরোধী বৈশ্বিক অক্ষ-শক্তির সাথে সহযোগিতা এবং কালক্রমে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথে যখন আজাদে হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে পড়লো তখন এই ধারার প্রাথমিক কালপর্ব ব্যর্থতার মুখ দেখে।

পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলন ও তৎপরবর্তী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের যুগে এইধারা সুপ্ত আকারে টিকে থাকে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের জনযুদ্ধের পরে যখন নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজাল ভেঙ্গে গণমানুষের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ সশস্ত্র রুপ নেয় তখন এই ধারা আবারও পুনর্জাগরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই বরিশালের পেয়ারা বাগানে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি কমরেড সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে মুক্তাঞ্চল কায়েম করে কলোনিয়াল ব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটান। যুদ্ধ শেষে আওয়ামী বাকশাল ও ভারতীয় আধিপত্যে বীতশ্রদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা জাসদ গণবাহিনীতে একীভূত হয়ে নির্বাচন ও গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির বেড়াজাল পেরিয়ে গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে উপনীত হয়।

গণমানুষের চলমান যাপিত জীবনের লড়াই, স্থানীয় সামাজিক স্বতঃস্ফুর্ত শক্তিকে তার নিজের নিয়মেই সংগঠিত না করে ছোট ছোট গ্রুপ কেন্দ্রীক অস্ত্রবাজী এবং বাস্তবতার সংস্পর্শহীন মতাদর্শিক রণকৌশলের ফলে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগ স্বীকার করেও এই ধারা ব্যাপক, বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি যা গণবিরোধী শক্তির সক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ এর ক্যু এবং “গণবিচ্ছিন্ন খতম রাজনীতি”, এই আধুনিক ধারাকে ধীরে ধীরে জনগণের কাছ থেকে দূরেই নিয়ে গিয়েছে। জনগণের যাপিত জীবনের লড়াইকে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তুলে গণবিরোধী শক্তির জালেম সত্ত্বার মোকাবেলা করা এবং জুলুমের বিপরীতে গণমানুষের স্বতঃস্ফুর্ত প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামকেই প্রয়োজনে র‍্যাডিকাল রুপ দেয়ার অর্গানিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে, অপ্রয়োজনে হঠকারিতা ও অস্ত্রবাজী করতে গিয়ে এই আধুনিক ধারা অসংখ্য তরুন বিপ্লবীদের অকাল কবর রচনা করেছে।

তবে চব্বিশে গণঅভ্যুত্থানের উত্তুঙ্গ মূহুর্তে খুনীর বুলেটের মোকাবেলায় এই আধুনিক ধারার শহীদেরা যেন মৃত আর জীবিতের পর্দা ভেদ করে ভর করেছিলেন আমাদের দামাল লড়াকু ছাত্র-জনতার ওপরে। এই জজবা এবং লড়াইয়ের প্রাণচাঞ্চল্য গণবিপ্লবী লড়াইয়ের এই ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একমাত্র গণতান্ত্রিক ও গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তৈরি হওয়া গণআন্দোলনের প্রতি ঈমান আনার মধ্য দিয়েই এই ধারা তাদের বীরত্ব ও তেজকে যথাযথ সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে। এই ধারার রণকৌশলগত জ্ঞান ও দক্ষতা অবশ্যই বিপ্লবী রাজনীতির সম্পদ তবে তা কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করতে হবে বাস্তব গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

সংস্কারবাদী ধারা

নব্বই পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একের পর এক নির্বাচনের পরেও দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি তৈরি না হয়ে যখন রাজনৈতিক সহিংসতা, দমন-পীড়নের ধারাবাহিকতা রয়েই যায়, তখন দেশের সচেতন রাজনৈতিক পরিসরে নির্বাচন ও গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতি কেন্দ্র করে জারি থাকা গণতন্ত্রের নাটক পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সমস্যাটা যে মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রেখে যাওয়া শোষন-দমনমূলক রাষ্ট্রের ডিজাইনেই এই ধারণাটি হাজির হয়। একই মডেলের গাড়িকে (রাষ্ট্র) বারবার বাইরে থেকে রং পাল্টালে (পাকিস্তান, বাংলাদেশ) কিংবা ভেতরের ড্রাইভার (ভিন্ন ভিন্ন সরকার) বদলালেও গাড়ি যে ডিজাইনের, গাড়ি যে সেভাবেই চলে সেটা এই সময়ে রাজনৈতিক চিন্তা ও আলাপে হাজির হয়।

এই সময়ে রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি হাজির হয়। নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক চুক্তির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মান কিংবা শাসন-শোষনের কাঠামোর বিকল্প হিসেবে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের নানা তাৎক্ষনিক বিকল্প রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে আদর্শিক বাম ও ডান ঘরানা থেকে গণসংহতি আন্দোলন এবং আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) মতো রাজনৈতিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। "রাষ্ট্রচিন্তা"র মতো বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ধারা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়।

সামাজিক-রাজনৈতিক চুক্তির ধারণা কিংবা পশ্চিম ইউরোপীয় কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা তত্ত্বের জায়গা থেকে নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রকল্প হাজির করলেও এইজন্য যে বিদ্যমান কলোনিয়াল শাসন-শোষনমূলক রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে হবে এবং গণমানুষের অংশগ্রহণে একেবারেই নতুন রাষ্ট্র তৃণমূল থেকে ডিজাইন করে গড়ে তুলতে হবে সেই সচেতনতা কিংবা আকাঙ্ক্ষা এই ধারায় প্রকাশিত হয় নি। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন কলোনিয়াল কাঠামোকে আইনী এবং সাংবিধানিকভাবেই একটি জালেম ব্যবস্থা হিসেবে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষাকে তাত্ত্বিকভাবে হাজির করলেও গণবিচ্ছিন্ন ধারার রাজনীতি নিয়ে পরিষ্কার বিশ্লেষন ও সচেতনতা না থাকায় এই ধারা নির্বাচনকেন্দ্রীক "গণতন্ত্র মঞ্চ" নামক জোট করে তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রবেশ করে। এই সময়ে সামরিক শাসন, ছদ্ম গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের অভিজ্ঞতায় নিষ্পেষিত মানুষ তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারে যে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের মুক্তি আসবে না।

জনগণের এই আস্থাহীনতাকে উপলব্ধি করে নিজেদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে জনগণকে অংশ নিতে আগ্রহী করতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী জোট এই সময়ে রাষ্ট্র কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের সংস্কারবাদী রাজনীতি গ্রহন করে এবং রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা প্রণয়ন করে। কিন্তু গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদেরা কিভাবে

গণমানুষের রক্ত ঝরিয়ে তা নিয়ে সওদা করে নিজের আখের গুছিয়ে নেয় সে ব্যাপারেও ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায় জনগণ বিএনপি বা প্রধান বিরোধী দলকেন্দ্রীক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রকৃত অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

ফ্যাসিবাদী গণবিরোধী শক্তি কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনে গুলি চালিয়ে জমে থাকা গণবিক্ষোভ উসকে দিলে এই সময়ে জনগণ **"বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন"** এর মতো নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরের ব্যানারে সংগঠিত হয়ে গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত করে এবং পুরোনো শাসন-শোষন কাঠামোকে পরাজিত করে।

সংস্কারবাদী চিন্তার প্রাধান্য থাকায় এই সময়ে সবচেয়ে প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রায় কেউই জনগণের অংশগ্রহণে গণমানুষের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার কর্তব্য উপলব্ধি করেননি বরং পরাজিত শাসন-শোষণ কাঠামো, পুলিশ, আদালত, সচিবালয়, কমিশনগুলোকে ফিরিয়ে এনে তাদের সংস্কার করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রজেক্ট শুরু করেন। ফলে পুরনো সংবিধান বহাল হয়, পুরনো শাসন-শোষণ কাঠামোও বহাল হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মধ্য দিয়ে।

এই চিন্তা ধারার প্রভাবেই সংস্কার কমিশন কেন্দ্রীক রাষ্ট্র সংস্কারের কার্যক্রম শুরু হয়, যা বর্তমানে গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর চাপে গুটিকয়েক পরিবর্তনের পরিকল্পনা সংবলিত একটি জুলাই সনদে পর্যবসিত হয়েছে যা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত প্রকৃত গণমানুষের রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার সিকিভাগও ধারন করতে পারে নি। উপরন্তু যেইখানে মানুষ তার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গণঅভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের প্রতিনিধি সরকারের হাতে রাষ্ট্রকে নতুন করে গঠন করার ম্যান্ডেট হাতে তুলে দিয়েছিলো সেইখানে অহেতুক গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতিবিদদের তোষণ করতে গিয়ে সেই ক্ষমতা নিজ হাতে নষ্ট করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখন জুলাই সনদের মতো একেবারেই অপর্যাপ্ত ও সীমিত সংস্কার প্রস্তাবগুলোকেও গণভোটের মতো জটিল প্রক্রিয়ায় নিয়ে গিয়েছে যেখানে গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতিবিদদের বিভাজনমূলক রাজনীতির ফলে না ভোট জয়যুক্ত হলে এমনকি জুলাই সনদের মতো ন্যূনতমেরও ন্যূনতম রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব বানের জলে ভেসে যাবে।

সংস্কার কমিশন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুঃখজনক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার প্যারাডাইমের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছে। পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, দূর্নীতিবাজ ও জালেম সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা রাজপথে পরাজিত করেছে। তাদের ফিরিয়ে এনে আবার তাদেরকে দিয়েই তাদের সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চরমতম ইউটোপিয়ান চিন্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে। ফিরে আসা গণবিরোধী সকল প্রতিষ্ঠানগুলোই ভেতর থেকে সংস্কার প্রক্রিয়াকে বারবার স্যাবোটাজ(অন্তর্ঘাত) করেছে। পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর ঘাড়ে চড়ে, জালেম, লুটেরা সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র দিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার করতে চাওয়ার ইউটোপিয়ান প্রজেক্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ধারা

আমরা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবীগণ তারাই, যারা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৮৫৭ এর সিপাহী জনতার মহাবিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ৪৭ এর মুক্তিসংগ্রাম, ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানসহ সকল গণ-সংগ্রামের সিলসিলায় সরাসরি গণবিরোধী শক্তির মোকাবেলা করে এবং শাসন-শোষণের জালেমি ব্যবস্থা পুরোপুরি উৎখাত করার লক্ষ্যে গণসংগ্রাম সংগঠিত করার রাজনৈতিক কর্তব্যকে ধারন করি ও চর্চা করি।

আমরা, সকল শ্রেণি, পেশা, ধর্ম, বর্ণের গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও যথাযথ অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে গণপরিষদ কায়েম করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নকশা তৈয়ার করতে চাই যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বলয় তৈরী হবে। এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সমাজের সর্বস্তরে মানবিক আত্মমর্যাদা, সাম্য তথা সুযোগের সমতা এবং ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

আমরা একটি প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে চাই, যা যেকোনো বৈদেশিক আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদকে মোকাবেলা করতে পারবে এবং বৈশ্বিক মজলুমের লড়াইয়ের একটি ঘাঁটি অঞ্চল হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ করা হয় যে আমরা হঠকারী এবং অতিবিপ্লবী, যা নাকি গণতন্ত্র বিরোধী। অথচ আমরা ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যের দিকেই নির্দেশ করি যে, কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিপ্লব ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ইউরোপ ও পশ্চিমে গৌরবজনক বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব কিংবা ফরাসী বিপ্লবের মতো রক্তাক্ত গণসংগ্রামের মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা এই অবধারিত পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করি যে, একটি অগণতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, সেই সমাজের অগণতান্ত্রিক শাসক-আমলা শ্রেণি, লুটেরা শ্রেণি এবং তাদের দোসর, অভিভাবকেরা গণমানুষের ওপরে যে তীব্র রক্তক্ষয়ী জুলুম-নির্যাতন, গুম, খুন চাপিয়ে দেয় তার বিপরীতে গণমানুষের ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আমরাই কেবল আমাদের সমাজে গণবিরোধী শক্তি ও গণবিচ্ছিন্ন এলিট রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করে দেখাই যে, এই অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক বৃহৎ রাজনৈতিক দলকেন্দ্রীক রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা আসলে প্রকৃত গণতন্ত্র নয় এবং তার সাথে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন ব্যবস্থার কোনো মূলগত সাদৃশ্য নেই। আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের নামে মূলত বৈদেশিক শক্তির আনুকূল্যে ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারার নাটক মঞ্চস্থ হয় সেই সত্য আমরা উন্মোচন করি কেবল।

আমাদের ব্যাপারে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার অভিযোগ আনা হয়। অথচ কলোনিয়াল আইন-সংবিধান যা জনগণকে বিভক্ত করে রাখে, দমন করে ও শোষণের কাঠামো টিকিয়ে রাখে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা মানে গণমানুষেরই বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। এই শাসন-শোষণ কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করাই প্রকৃত সুশৃঙ্খল মুক্তিকামী লড়াইয়ের পন্থা এবং এই লড়াই সংগঠিত না হলেই গণবিরোধী শক্তি ও গণবিচ্ছিন্ন এলিট ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গণমানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে, সংঘাতে জড়ায় এবং সহিংসতার সংস্কৃতি কায়েম হয়। সহিংসতার উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের আইন-সংবিধানই সমাজে সহিংসতা কায়েম করে। এই অঞ্চলে পশ্চিম ইউরোপের মতো প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি তাই কলোনিয়াল আইন মেনে চললে এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং সহিংসতা ও শোষণ-নির্ভর ব্যবস্থাই বৈধতা লাভ করে। গণমানুষের লড়াই নয় বরং এই জালেমি ব্যবস্থাই সকল মব কিংবা সন্ত্রাসের গোড়া।

আমাদের বিরুদ্ধে ইউটোপিয়ানিজমের কিংবা অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিযোগ আনা হয়। আমাদের লক্ষ্য কখনো সফল হবে কিনা এই ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়। অথচ আমরা কেবল চলমান ঐতিহাসিকতার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেই ।

আমরা এই বাস্তব এবং সমসাময়িক গণমানুষের লড়াইয়ের দিকেই ইঙ্গিত করি যা ইতিমধ্যেই উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নেপালে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণপরিষদ গঠন ও নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় গণ-অভ্যুত্থানের পরে নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক সংগ্রাম এখনো চলমান যা নেপালেও নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের লড়াই দিনকে দিন জোরদার হচ্ছে। আমরা মূলত বাস্তব জগতেই ঘটে যাওয়া এবং ঘটতে থাকা ঐতিহাসিক চলমানতাকে উপলব্ধি করে তার ভিত্তিতে গণমানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

আমরা, প্রকৃত গণ-বিপ্লবের সমর্থক, সহযোগী, কর্মী ও সংগঠকগণ বাংলাদেশে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের শত শত বছরব্যাপী রক্তাক্ত লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়েছি। চূড়ান্ত লড়াইয়ের এই পর্যায়ে আমাদের সংগ্রাম সফল হবেই। দক্ষিণ এশিয়া, ফিলিস্তিন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত মানুষের চলমান লড়াই পূর্ণ বিজয়ে উপনীত হবেই। আমাদের পূর্বসুরীদের মহান আত্মত্যাগের স্মৃতিকে ধারণ করে আমরা এই অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক বিজয় উদযাপনের পথে এগিয়ে যাবো।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা,
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনুনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মা'য়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মা'য়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মা'য়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃদপিন্ডে ধরে রাখতে পারে না।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
আমরা কি তা'র মতো কবিতার কথা বলতে পারবো,
আমরা কি তা'র মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো!
তিনি মৃত্তিকার গভীরে
কর্ষণের কথা বলতেন
অবগাহিত ক্ষেত্রে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপনের কথা বলতেন
সবৎসা গাভীর মত
দুগ্ধবতী শস্যের পরিচর্যার কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
যে কর্ষণ করে তাঁর প্রতিটি স্বেদবিন্দু কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
শস্যহীন প্রান্তর তাকে পরিহাস করবে।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্ষুধার্ত থেকে যাবে।
যখন প্রবঞ্চক ভূস্বামীর প্রচন্ড দাবদাহ
আমাদের শস্যকে বিপর্যস্ত করলো
তখন আমরা শ্রাবণের মেঘের মত
যূথবদ্ধ হলাম।
বর্ষণের স্নিগ্ধ প্রলেপে
মৃত মৃত্তিকাকে সঞ্জীবিত করলাম।
বারিসিক্ত ভূমিতে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করলাম।
সুগঠিত স্বেদবিন্দুর মত
শস্যের সৌকর্য অবলোকন করলাম,
এবং এক অবিশ্বাস্য আঘ্রাণ
আনিঃশ্বাস গ্রহণ করলাম।
তখন বিষসর্প প্রভুগণ
অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলো
এবং আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট তাম্রলিপির মত
রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম।
তখন আমরা সমবেত কন্ঠে
কবিতাকে ধারণ করলাম।
দিগন্ত বিদীর্ণ করা বজ্রের উদ্ভাসন কবিতা
রক্তজবার মত প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
পরভৃতের গ্লানি তাকে ভূলুণ্ঠিত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
অভ্যূত্থানের জলোচ্ছ্বাস তাকে নতজানু করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
পলিমাটির সৌরভ তাকে পরিত্যাগ করবে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

তিনি স্বপ্নের মত সত্য ভাষণের কথা বলতেন
সুপ্রাচীন সংগীতের আশ্চর্য ব্যাপ্তির কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
যখন কবিকে হত্যা করা হল
তখন আমরা নদী এবং সমুদ্রের মোহনার মত
সৌভ্রত্রে সম্মিলিত হলাম।
প্রজ্জ্বলিত সূর্যের মত অগ্নিগর্ভ হলাম।
ক্ষিপ্রগতি বিদ্যুতের মত
ত্রিভূবন পরিভ্রমণ করলাম।
এবং হিংস্র ঘাতক নতজানু হয়ে
কবিতার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো।
তখন আমরা দুঃখকে ক্রোধ
এবং ক্রোধকে আনন্দিত করলাম।
নদী এবং সমুদ্রে মোহনার মত
সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কবিতা
অবদমিত ক্রোধের আনন্দিত উৎসারণ কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে তরঙ্গের সৌহার্দ থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
নিঃসঙ্গ বিষাদ তাকে অভিশপ্ত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মূক ও বধির থেকে যাবে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
আমি একগুচ্ছ রক্তজবার কথা বলছি।
আমি জলোচ্ছ্বাসের মত
অভ্যূত্থানের কথা বলছি
উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মত
কমলের চোখের কথা বলছি
প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত
সহস্র ক্ষতের কথা বলছি

আমি নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জননীর কথা বলছি
আমি বহমান মৃত্যু
এবং স্বাধীনতার কথা বলছি।
যখন রাজশক্তি আমাদের আঘাত করলো
তখন আমরা প্রাচীণ সংগীতের মত
ঋজু এবং সংহত হলাম।
পর্বত শৃংগের মত
মহাকাশকে স্পর্শ করলাম।
দিকচক্রবালের মত
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলাম;
এবং শ্বেত সন্ত্রাসকে
সমূলে উৎপাটিত করলাম।
তখন আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের মত
উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত হলাম।
উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের প্রস্ফুটিত ক্ষতচিহ্ন কবিতা
স্পর্ধিত মধ্যাহ্নের আলোকিত উম্মোচন কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নীলিমাকে স্পর্শ করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মধ্যাহ্নের প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত হতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্ত্রাসের প্রতিহত করতে পারে না।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি শ্রমজীবী মানুষের
উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
আদিবাস অরণ্যের
অনার্য সংহতির কথা বলছি
শৃংখলিত বৃক্ষের
উর্দ্ধমুখী অহংকারের কথা বলছি,
আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।
শৃংখলিত বৃক্ষের উর্দ্ধমুখী অহংকার কবিতা

আদিবাস অরণ্যের অনার্য সংহতি কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
যূথভ্রষ্ট বিশৃংখলা তাকে বিপর্যস্ত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
বিভ্রান্ত অবক্ষয় তাকে দৃষ্টিহীন করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম হীনমন্য থেকে যাবে।
যখন আমরা নগরীতে প্রবেশ করলাম
তখন চতুর্দিকে ক্ষুধা।
নিঃসঙ্গ মৃত্তিকা শস্যহীন
ফলবতী বৃক্ষরাজি নিস্ফল
এবং ভাসমান ভূখন্ডের মত
ছিন্নমূল মানুষেরা ক্ষুধার্ত।
যখন আমরা নগরীতে প্রবেশ করলাম
তখন আদিগন্ত বিশৃংখলা।
নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জননী শোকসন্তপ্ত
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ বিভ্রান্ত
এবং রক্তবর্ণ কমলের মত
বিস্ফোরিত নেত্র দৃষ্টিহীন।
তখন আমরা পূর্বপুরুষকে
স্মরণ করলাম।
প্রপিতামহের বীর গাঁথা
স্মরণ করলাম।
আদিবাসী অরণ্য এবং নতজানু শ্বাপদের কথা
স্মরণ করলাম।
তখন আমরা পর্বতের মত অবিচল
এবং ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির লক্ষ্য হলাম।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি স্থির লক্ষ্য মানুষের
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা বলছি
শ্রেণিযুদ্ধের অলিন্দে

ইতিহাসের বিচরণের কথা বলছি
আমি ইতিহাস এবং স্বপ্নের কথা বলছি।
স্বপ্নের মত সত্যভাষণ ইতিহাস
ইতিহাসের আনন্দিত অভিজ্ঞান কবিতা
যে বিনিদ্র সে স্বপ্ন দেখতে পারে না
যে অসুখী সে কবিতা লিখতে পারে না।
যে উদ্গত অংকুরের মত আনন্দিত
সে কবি
যে সত্যের মত স্বপ্নভাবী
সে কবি
যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসবে
তখন প্রত্যেকে কবি।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত বর্তমান
এবং অন্তিম সংগ্রামের কথা বলছি।
খন্ডযুদ্ধের বিরতিতে
আমরা ভূমি কর্ষণ করেছি।
হত্যা এবং ঘাতকের সংকীর্ণ ছায়াপথে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করেছি।
এবং প্রবহমান নদীর সুকুমার দাক্ষিণ্যে
শস্যের পরিচর্যা করছি।
আমাদের মুখাবয়ব অসুন্দর
কারণ বিকৃতির প্রতি ঘৃণা
মানুষকে কুশ্রী করে দ্যায়।
আমাদের কণ্ঠস্বর রূঢ়
কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ
কণ্ঠকে কর্কশ করে তোলে।
আমাদের পৃষ্ঠদেশে নাক্ষত্রিক ক্ষতচিহ্ন
কারণ উচ্চারিত শব্দ আশ্চর্য বিশ্বাসঘাতক
আমাদেরকে বারবার বধ্যভূমিতে উপনীত করেছে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমার সন্তানেরা
আমি তোমাদের বলছি।
যেদিন প্রতিটি উচ্চারিত শব্দ
সূর্যের মত সত্য হবে
সেই ভবিষ্যতের কথা বলছি,
সেই ভবিষ্যতের কবিতার কথা বলছি।
আমি বিষসর্প প্রভুদের
চির প্রয়াণের কথা বলছি
দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের
পরিসমাপ্তির কথা বলছি
সুতীব্র ঘৃণার
চূড়ান্ত অবসানের কথা বলছি।
আমি সুপুরুষ ভালবাসার
সুকণ্ঠ সংগীতের কথা বলছি।
যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গাভীর পরিচর্যা করে
জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখন্ডকে প্রজ্জ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালবাসার কথা বলছি।
আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
আমরা কি তাঁর মত কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মত স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো ?

- **আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ**

সমাপ্ত